# কল্পতরু।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

"— — Et me fecere poetam
Pierides : * * * * : me quoque dicunt
Vatem pastores ; sed non ego credulus illis .
Nam neque adhuc Varo videor, nec dicere Cinnâ
Digna, sed argutos inter strepere anser olores."

*Virgil.*

কলিকাতা।
ক্যানিঙ্ লাইব্রেরী
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।
কলেজ ষ্ট্রীট।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১।

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

২১নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট।

# প্রণয়াধার

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্

মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

প্রেমোপঢৌকন

দিলাম।

---

"শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা ?"

---

দিনাজপুর।
জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯।

গ্রন্থকারস্য।

# ভ্রম-শোধন।

৩৯ পৃঃ ১৩ পংক্তি।

"নিবিষ্ট চিত্তে অন্য উপায়ের অভাব" এই রূপ পাঠ করিতে হইবে।

# প্রণয়াধার

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্

মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

প্রেমোপঢৌকন

দিলাম।

---

"শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা ?"

---

দিনাজপুর।<br>
জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১।

গ্রন্থকারস্য।

# ভ্রম-শোধন।

৩৯ পৃঃ ১৩ পংক্তি।

"নিবিষ্ট চিত্তে অন্য উপায়ের অভাব" এই রূপ পাঠ করিতে হইবে।

# কল্পতরু।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কুস্থানাদপি কাঞ্চনং"।

৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার বেলা ২টা ৩৫ মিনিটের সময় তৃতীয় শ্রেণীর একখানা ভাড়াটে গাড়ী হাটখোলার একটী দোতালা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া, রণবাদ্য বন্ধ করিল। ঘোড়া দুইটার মধ্যে যেটা অন্যটা অপেক্ষা উর্দ্ধে আধ হাত কম, তাহার লাগামের নীচে দিয়া যে পরিমাণ জিহ্বা বাহির হইল, তাহাতে খর্ব্বতার মায় সুদ ক্ষতিপূরণ হইল। বাম-চক্ষুহীন অশ্বিনীকুমারের দক্ষিণ নেত্র হইতে দরদরিত ধারা বিগলিত হইতে লাগিল; গর্দ্দভশ্রবা বুঝি এই ভাবিয়া কাঁদিতেছিল যে "এখনি ত আবার চাবুক ভরে চলিতে হইবে, তবে একবার আরম্ভ করিয়া ইহ অশ্বজন্মের শেষ পর্য্যন্ত চালাইয়া লয় না কেন? মাঝে মাঝে থামাইয়া বিদ্যুৎ-

আলোকিত অমা রজনীর ন্যায় গাড়ী টানা জীবনকে দ্বিগুণ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে কেন?" আহা! পাঠক মহাশয় যদি সহৃদয় হন, অবশ্যই ইহার দুঃখে দুঃখী হইবেন; যদি ইহার সুখ থাকিত, তবে সুখের সুখীও হইতে পারিতেন। এ পক্ষ (গ্রন্থকার) প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "মুনসুফী স্বীকার করিব, হাল আমলের ডিপুটী হইব, তথাপি ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া হইতে পারিব না"—আপনি বলুন "তথাস্তু"!

গাড়ী থামিল। নরেন্দ্রনাথ সলম্ফে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন, পাছে গাড়ীর চরণাধারে পা দিলে ভাঙ্গিয়া পড়ে, অর্থাৎ তিনি চাকার উপর পড়েন—তাহা হইলে চাকার দাম লাগিবে। কলিকাতার গাড়ীর অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণের শরীরে মমতা অল্প। নরেন্দ্রনাথ গরণেটের চায়না কোটের বুকের পকেট হইতে ঘড়ী টানিয়া বাহির করিলেন; ঘড়ীর ডালা খুলিলেন, ঘড়ী কর্ণে সংলগ্ন করিলেন, মুখ (নিজের) কিঞ্চিৎ বিকৃত করিলেন, বলিলেন "দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিট"। একখানি রুমাল বাহির করিয়া একটী শিকি এবং আটটী পয়সা গাড়ীওয়ানের সমলকর-কমলে হাত বাড়াইয়া দিলেন। গাড়ীওয়ান বলিল "ঘণ্টা ভর্‌সে বেশী হুয়া"। নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন "সমস্ত দিন লাগে নাই, এই পরম লাভ, কিন্তু আমি তার দায়ী হইতে পারি না," বলিয়া শিঁড়ির উপর উঠিলেন। পলাণ্ডু-সুবাসিত গালিকা-পুষ্প বৃষ্টি করিতে করিতে, রথাধিষ্ঠাতা গালের মধ্যে এবং

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ অনির্ব্বচনীয় শব্দ বাহির করিল রণবাদ্য করিতে করিতে পুষ্পকরথ জড় পদার্থের নিশ্চেষ্টতা সপ্রমাণ করিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ উপরে গিয়া বিছানায় নিজ স্থূল কলেবর স্থাপিত করিলেন, যাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তিনি পশ্চাতে তাকিয়া, সম্মুখে ভুঁড়ি ও তদগ্রে একটা বাক্স লইয়া বসিয়া ছিলেন। নরেন্দ্রও সেই বাক্স সম্মুখে করিয়া বসিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা (বা ভাড়াটিয়া কর্ত্তা, কারণ তিনি একজন মহাজনের প্রধান কার্য্যকারক) আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন "বস, ভাল আছ ত? অনেক দিন যে দেখা নাই?"

নরেন্দ্র। "আজ্ঞে, পরীক্ষা সম্মুখ, অবকাশ অল্প, তাই আসিতে পারি নাই। বাইশ দিন পরে পরীক্ষা হইবে।" নরেন্দ্রনাথ এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমপরীক্ষা দিবেন। ইঁহার বয়স বাইশ বৎসরের বেশী হইবে না।

উভয়ে আলাপ হইতেছে, নরেন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে বাটীর নূতন দাসী তামাক সাজিয়া হুকা হস্তে দাঁড়াইয়াছিল, ইহা তাঁহারা দেখেন নাই। দাসীও আসিয়া কোন কথা কহে নাই, কেবল কালো গাল দুখানি ফুলাইয়া কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে ছিল, আর (তাহার নেত্রদৃষ্টিতে বোধ হয়) নরেন্দ্রের রূপ কল্পনা করিতে ছিল, কারণ দাসীও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই পরস্পরের অপরিচিত। নরেন্দ্রনাথের রূপ বাস্ত-

বিক অদর্শনীয় নহে। তবে, ইট, চূণ, শুরকী, কাট পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে যেমন অট্টালিকার শোভা অনুভব করা দুষ্কর, তদ্রূপ অঙ্গে অঙ্গে বর্ণন করিলে নরেন্দ্রের মূর্ত্তিও ঠিক করা দুঃসাধ্য।

গ্রন্থকারেরা, বিশেষতঃ নবাখ্যা-লেখকগণ গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিগণের রূপ বর্ণন না করিলে পাছে ঘুমের ব্যাঘাত হইবে, এই আশঙ্কায় একটী কুদৃষ্টান্ত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত অনিষ্ট সম্ভাবনা সত্বেও আমার খ্যাতিচন্দ্র নিন্দা রাহুগ্রস্ত না হন, এই ভাবিয়া আমিও আবশ্যক মত রূপ বর্ণনা করিতে থাকিব। 'ক্ষীরগ্রাহী মরাল পাঠকগণ নীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দোষ মার্জ্জনা করিবেন'।

অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায়, নরেন্দ্রনাথও একটা মাংস-পিণ্ড। প্রভেদের মধ্যে এই যে কাহারও কাহারও হাড়ের ঠিকানা দেখিলেই করা যায়, নরেন্দ্রনাথের অস্থি-নির্ণয় সহজ ব্যাপার নয়। নরেন্দ্রের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, যেমন মেটে পাথর। কপাল ছোট, গড়ের মাঠের মত প্রশস্ত নয়। ভ্রূযুগলের সহিত নিবিড় গহন কাননের তুলনা হয় না, কে হারে কে জেতে, বলিতে পারি না। যদি গজেন্দ্র গমনে ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক নায়িকা প্রশংসা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তবে আমার নরেন্দ্রনাথও গজেন্দ্র-নয়নের জন্য অবশ্য প্রশংসা পাইবেন। নাসিকা ছোট, দীর্ঘে দুটা তিলফুলের সমান; আড়ে আড়ে নাকের মধ্য স্থল নিরূপিত হইতে

পারে না, এমনি সুগোল। যাঁহারা পৃথিবীর মানচিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নরেন্দ্রনাথের গালের বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। ওষ্ঠাধর বিম্ববৎ, কেবল পান খাইলে লাল না হইয়া তামার মত দেখাইত। নরেন্দ্রনাথ গজগ্রীব, গজস্কন্ধ, গজদেহ, গজপদ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে গজ বলা যায় না; কারণ সকলেই তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মনুষ্য বলিয়া চিনিতে পারে, গজভ্রম কস্মিন্‌কালে কাহারও হয় নাই। নরেন্দ্রনাথ যে সুশ্রী, তাহা আমরা এক বাক্যে নিশ্চয় করিতে পারি, কারণ 'রণে বনে শত্রুসনে হুতাশনে বা বিজনে' কখনই তাঁহার মনে, সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।

নরেন্দ্রনাথ দাসীকে দেখিলেন। দাসীর বয়স যৌবনের হাত ছাড়াই ছাড়াই করিতেছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নরেন্দ্র বলিলেন, 'আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের কি দুর্ভাগ্য! রাজরাণী হইলেও অন্তঃপুরে বন্দী, নয় পথের কাঙ্গালিনী। এ অবস্থা কি যাইবে না?' কর্ত্তা বা গদিয়ান বাবু কোন কথা কহিলেন না; নরেন্দ্র যে নবীন ব্রাহ্ম, তাহাও তিনি জানিতেন না। পরে অনেক আলাপাদি করিয়া কর্ত্তার হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া নরেন্দ্র দুই বার বাহিরে তামাক খাইয়া আসিলেন; দ্বিতীয় বারে কর্ত্তার হস্তে হুঁকা দিয়া বাসায় যাইবার অনুমতি লইবেন, এমন সময়ে সিংহ-শৃগাল-নাদ করিতে করিতে রামদাস আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামদাস 'ভুশি মালের' দালালী করিত; মলিন বস্ত্র পরিধান, পায় জুতা নাই, গা খোলা, একখানি মলিন মলমলের চাদর বাম স্কন্ধে দোদুল্যমান, যখন রামদাস ঘরে প্রবেশ করিল, তখন চাদরের এক কোণে চারটী গম, এক কোণে আতপ চাউল, এক কোণে ছোলা। হাঁপাইতে হাঁপাইতে রামদাস গদিয়ান বাবুর হাত হইতে হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে বসিল। রামদাস যেন সদা শশব্যস্ত। সুমধুর গর্জ্জন স্বরে বলিল 'আর মশায়, চার পয়সা উপর দিতে চাইলাম, তাও দিলেন না। ঐ নন্দী শালাই আপনাদের ভাল। মহাশয়, গরিব ব'লে কটাক্ষে দেখ্‌তে হয়।' গদিয়ান বাবু বলিলেন 'রাম বাবু সে কথা হবে; তুমি একজন প্রধান দালাল, কত জায়গায় সওদা কর্‌বে। এখন, আমাদের নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন দিন আলাপ হয়েছে?'

রাম। 'ইনিই নাকি! হায় হায়, হায়, হায়! ইনি ত 'মাই ডিয়ার' ছোকরা' (নরেন্দ্রের প্রতি) 'বাবু, চিন্‌তে হয়, এক দেশে বাড়ী; গরিব ব'লে পায়ে ঠেল্‌তে হয় না।' নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইলেন, অপরিচিত লোকে এ প্রকার আলাপ করে দেখিয়া, একটু আশ্চর্য্যও বোধ হইল, কিন্তু সকল মনুষ্য সমান জ্ঞানবান্ হইতে পারে না, এই ভাবিয়া বলিলেন 'পূর্ব্বে কখন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, এখন অবশ্যই বিশেষ পরিচয় হইবে।'

রামদাস। 'এই ত মাই ডিয়ারের মত কথা। বাবু, আপনি কত বড় লোক! না হবে কেন? গরিব ব'লে পায়ে ঠেল্‌বেন না, কটাক্ষ রাখা উচিত। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আস্‌চি। আজকেই আপনার সঙ্গে গিয়ে আপনার বাসা দেখিয়া আসিব।' নরেন্দ্র কি করেন, বসিয়া থাকিলেন।

রামদাসের বয়স ৩০।৩২ বৎসর। গলা অবধি হাঁটু পর্য্যন্ত, তাহার দৈর্ঘ্য সওয়া গজ; মাথা অবধি পা পর্য্যন্ত ধরিলে দুই গজের ন্যূন হইবে না। বক্ষঃস্থলে শরীরের বেড় এক গজের কিছু বেশী বেশী। মাংসপেশী সমস্ত বিলক্ষণ পুষ্ট, হাড় খুব মোটা মোটা। কেশ মোটা ও রুক্ষ। শরীরের রং কালো, আবলুশ কাষ্ঠ হইতে ফরসা কিন্তু কর্কশ। দশ পনর দিন অন্তরে নাপিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, সুতরাং মুখ প্রায়ই পরিপাটী দেখাইত না। কট্‌মটে চোখের তারা দুটী ভ্রমরের মত কাল কিম্বা এক-রঙ্গা নয়, রামধনুর মত সাত-রঙ্গাও নয়, মাঝা মাঝি। ইহার শরীরের আয়তন এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আমরা যে প্রকারে জানিলাম, তাহা পাঠকবর্গের অগোচর রাখা অকর্ত্তব্য। একটা চাপকান তৈয়ার করিবার জন্য একজন দরজীকে রামদাস বরাত দিয়াছিলেন; তৈয়ার হইয়া আসিলে পর কিছু কশা কশি হইয়াছিল বলিয়া রামদাস দরজীর নিকটে চাপকান কাড়িয়া লন, এবং তাহার বেত-

নের পরিবর্ত্তে গালি দিয়া বিদায় করেন। চাপকানের কাপড় দরজী নিজ হইতে দিয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রামদাস দালালী করিত। রামদাস কুলীন ব্রাহ্মণ, কলিকাতায় তাহার শ্বশুরের বাসায় আহারাদি হইত, সুতরাং যাহা উপার্জ্জন তাহাই সঞ্চয়। রামদাস দালালী ভিন্ন অন্য উপায়ে উপার্জ্জন করিত কি না পরে দেখা যাইবে।

রামদাস ফিরিয়া আসিল। সে চুলে যে পারিপাট্য সম্ভবে, তাহা করা হইয়াছে। লাল-ফিতে-পেড়ে ধুতি মলিন বসনের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। গায়ে একটা শাটিনের ফতুই। যেখানে নরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন, সেই খানে বাক্সের ভিতর আতর ছিল, রামদাস সর্ব্বাঙ্গে মাখিল। গদিয়ান বাবু উঠিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার এক জোড়া শাল গায় দিল; এক জোড়া জুতা পড়িয়াছিল রামদাস পায় দিল। যাঁহার জুতা তিনি নিষেধ করিলেন। রামদাস 'নীচ যদি উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে' এই মহাবাক্যের সার্থকতা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে রামদাস বলিল 'বাবু, সঙ্গে টাকা আছে ত? না থাকে, ধার করিতে হয়! মেছোবাজারের ভিতর হইয়া ত যাইতে হইবে। বাবু, তোমরা ত লক্কা পায়রা। বড় লোক, লাড়্‌কেনি মার, আর ঘুরে২ বেড়াও। হায়, হায়, হায় হায়। রং দাও, খালিদাও'।

নরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াও বুঝিলেন না। নবীন ব্রাহ্মের সংস্কার ছিল কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কি জানি রামদাসের বিরুদ্ধ-বাদী হইলে পাছে তাহার মনে ক্লেশ জন্মে; বিশেষতঃ, সাধু অভিপ্রায়ে নরক পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, বরং যাওয়াই উচিত—নরকের যদি কোন হিত করিতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত, সর্ব্বত্রই জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে—'কুস্থানাদপি কাঞ্চনং'।

আবার নরেন্দ্রের মনে এই ছিল, তিনি সুশ্রী।

কতকদূর পদব্রজে গিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করা হইল। দুইজনে গাড়ীতে উঠিলেন। কিন্তু সে গাড়ী বাসা পর্য্যন্ত যায় নাই, তাহা আমরা জানি, আর কিছু বলিতে পারি না।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## দুষ্টের দমন।

পর দিন সূর্য্য উঠিল। আজি সূর্য্যের নিজের বার, বোধ হয় সেই জন্য অদ্য আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল। অন্যান্য দিন উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্র নাথের সঙ্গে দেখা হইত, অদ্য তাহা হইল না দেখিয়া সূর্য্যের রাগ হইল। গলির ভিতর দিয়া সূর্য্যের কিরণ-দূত আসিয়া গোলদীঘির ধারে নরেন্দ্রকে পাইল না; উত্তর দিকে রাস্তা পার হইয়া নরেন্দ্রের প্রাঙ্গণেও তাহাকে পাইল না। তখন ছাদের উপর উঠিয়া পূর্ব্ব দিকের খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিল, নরেন্দ্র খাটের উপর নিদ্রিত। নরেন্দ্রের মুখে রবিকর-স্পর্শ হইল। নরেন্দ্রনাথ জাগিলেন। চক্ষু দুটী বড় বড় কুঁচের মত শোভা পাইতে লাগিল। তখন বেলা নয়টা।

নরেন্দ্রনাথ স্নান আহার সমাপন করিলেন। সূর্য্য উঠিতে উঠিতে আর উঠিতে পারিলেন না, অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। আকাশেও কি একূণ র কারবার আছে?

ক্রমে ক্রমে বেলা ৩ টা বাজিল। নরেন্দ্রনাথ ঘরের দক্ষিণ দিকের দ্বার বন্ধ করিলেন। উত্তর দিকের জানালার খড়খড়ি তুলিয়া একবার দেখিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার মুখ ভঙ্গীতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ঘড়ীটা মিলাইবার জন্য বাহির করিলেন, ডালা তুলিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। গত কল্য হাটখোলায় এইরূপ তাঁহার বদন-মণ্ডলে কপিভাব জন্মিয়াছিল। ইহার কারণ আছে।

ঘড়ীর কাঁটা শিথিল হইয়া কখন্ কোন্ খানে থাকিত তাহার স্থিরতা ছিল না। তথাপি সেই ঘড়ী দেখিয়া—অথবা সেই ঘড়ীর উপর আন্তরিক বিশ্বাস করিয়া নরেন্দ্রনাথ গাড়ীর ভাড়ার হিসাব করিতেন। তাঁহার সংস্কার ছিল, আত্মা-বিশিষ্ট মনুষ্য যখন এত ভাণ করে, এত মিথ্যা কথা ব'লে, তখন এই নির্জীব পিত্তলময়ী ঘটিকার এইরূপ ব্যবহার হইবে ইহাতে বিচিত্র কি? অনেকেই—সময় সময়ে নরেন্দ্রনাথও —ইহার পাল্টা যুক্তি অবলম্বন করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

ঘড়ীর দম দিয়া, অথবা মনকে দম দিয়া নরেন্দ্রনাথ পুনরায় খড়খড়ি তুলিয়া উত্তর দিকে উঁকি মারিলেন। কিন্তু এ সময়ে ছাদে আসিয়া বসিয়া থাকে, নরেন্দ্র ভিন্ন এমন গরজ কাহারও ছিল না। সংসারের অসারতা ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নরেন্দ্রনাথ স্বীয় অভ্যাস-মত উত্তরের জানালার নীচে, উত্তর মুখে পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলেন;

এক এক বার নরেন্দ্রের কটাক্ষ-বাণ কাষ্ঠের খড়খড়ির ফাক ভেদ করিতে লাগিল। ইহার নিগূঢ় কারণ জানিবেন?

যে বাটীতে নরেন্দ্রের বাস, তাহার ঠিক উত্তরে দেড় হাত এক গলি ব্যবধান, অটোল বাপান্তবাগীশের একতলা বাড়ী। সোণাগাছী সিদ্ধেশ্বরীতলা প্রভৃতি স্থানে বাপান্ত-বাগীশের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত যজমান ছিল। এবং এই উপলক্ষে হরিদাস ঘোষ ইস্কোয়ের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে তাঁহার নিকটেও বিশেষ আদৃত হইতেন ও টাকা টা শিকে টা পাইতেন। বাপান্তবাগীশ দিনমান প্রায় যজমানদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর যে দিন যেমন, কিছু হাতে করিয়া আলয়ে আসিতেন। বাড়ীতে পঁয়তালিশ বৎসরের এক ব্রাহ্মণী, সাত বৎসরের এক কন্যা, সাড়ে সতর বছরের একমেটে, ঝুলবর্ণা, বড়ি-নাকী এক বিধবা ভ্রাতৃ-বধূ, আর ছত্রিশ বছরের বেঁটে চুল-কটা, চোখ-কটা, রং-কটা গোলাকৃতি বামা নাম্নী এক পরিচারিকা।

বামা প্রতিদিন বিছানা রৌদ্রে দিতে ছাদে আসিত, কাপড় মেলিতে এবং তুলিতে ছাদে আসিত, কোন কাজ না থাকিলে সে দিন কেবল ছাদ ঝাঁট দিতে আসিত; আবার সন্ধ্যার পরেই নরেন্দ্রনাথের জানালার পাশে বসিয়া কখন কখন বায়ু ভক্ষণ করিত। বামার দৃঢ় বিশ্বাস, নরেন্দ্র ফাঁদে পা দিয়াছে।

নরেন্দ্র কচি ছেলে নয়, তায় ধর্ম্মজ্ঞান-বিশিষ্ট। সন্ধ্যার পর দাসীকে স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সৎপ্রসঙ্গের উপদেশ দিতে নরেন্দ্রনাথের ত্রুটি ছিল না বটে, কিন্তু তাহারই মধ্যে মাছের তেলে মাছ ভাজিবার একটু মতলব ফল্গু নদীর মত তাঁহার হৃদয় মধ্যে নিয়ত প্রবাহিত ছিল। নরেন্দ্রনাথ মনে করিতেন,—যে দাসী সে সহায় সম্পত্তি বিহীনা, তাহার ব্রাহ্মিকা হইলেই কি আর না হইলেই কি? তবে পৃথিবী শুদ্ধ যদি হয়, তবে প্রকৃত মঙ্গল বটে। যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন তাঁহার উপদেশের প্রকৃত পাত্রী স্বতন্ত্র, যথা বাপান্তবাগীশের ভ্রাতৃবধূ।

পুস্তক হস্তে, ছাদদৃষ্টে নরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন। বামা ছাদের কাপড় শুকাইল, কি না, দেখিবার জন্য রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল। ক্রমে নরেন্দ্রের জানালার নিকট আসিয়া আলিসার উপর বসিল। নরেন্দ্রনাথের উপদেশ আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণ পরে ভ্রাতৃবধূও আসিয়া উপস্থিত। দাসীর নিকটে তিনিও উপদেশ শুনিতে বসিলেন। 'মনুষ্য মাত্রেই ভাই এবং—এবং ভগিনী—এবং। আপন পর ভেদ রাখা মহাপাপ; তুমি আমার আমি তোমার' —ভ্রাতৃবধূর মুখপানে খড়খড়ির ভিতর দিয়া অতি মৃদু স্বরে শান্তভাবে নরেন্দ্রনাথ এই প্রকার উপদেশ বর্ষণ করিতেছেন; এমন সময়ে নেপথ্যে 'বামা হেথায় আয় না, কাপড় তুল্‌তে

ক দিন লাগে ?' ইত্যাকার ধ্বনি হইল। বাপান্তবাগীশের ব্রাহ্মণী ডাকিয়াছেন, সুতরাং মুখ ফিরাইতে ফিরাইতে ব্যস্ত হইয়া বামাকে উঠিয়া যাইতে হইল। দুই জনের নিকট ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছিলেন, নরেন্দ্রনাথের স্বর্গীয় সুখ জন্মিয়াছিল। উঠিয়া যাইতে হইল বলিয়া বামার মনের সুখ সরিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে যোগ দিল। ভ্রাতৃবধূকে একলা পাইয়া নরেন্দ্রনাথ আত্মপর রহিতের উপদেশ গাঢ় করিয়া দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বাপান্তবাগীশের কন্যা আসিয়া বলিল 'কাকী, মা যে ডাক্‌ছে'। নরেন্দ্র নাথের দ্বারেও আঘাত হইল। দ্বার খুলিবা মাত্র, রামদাসের প্রবেশ। রামদাস গর্জ্জন করিয়া বলিল 'বাবু শুনেছি, শুনেছি। আপনাদের এই কাজ! ছি!'। অন্যত্রে যিনি যাহা করুন, তাহাতে রামদাসের লাভের সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্যে নয়। রামকমল ডাক্তার ও রাজা গোলোকেন্দ্র-নারায়ণের দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া রামদাস 'মাই ডিয়ার লক্কা পায়রাকে' কিঞ্চিৎ উপদেশ দিল। ভ্রাতৃবধূর অন্তর্দ্ধান অল্প অল্প দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু রামদাস সে বিষয়ে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিল না। নরেন্দ্রনাথের নিকট বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু 'আজি সমাজে যাইতে হইবে' বলিয়া নরেন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না। রাম দাস অগত্যা ফিরিয়া গেল, কিন্তু দুর্ব্বৃত্তি দমনের পন্থা না করিয়া গেল না।

বাসায় ফিরিয়া যাইবার সময়, রামদাস বাপান্তবাগীশের বাটী হইয়া গেল। বাপান্তবাগীশের জন্য অপেক্ষা করিয়া তাঁহার বাটীতে বসিয়া থাকিল; ভট্টাচার্য্য বাটী আসিলে, ইঙ্গিতে তাঁহাকে কিছু বলিল। অগ্নিশর্ম্মা বাপান্তবাগীশ রামদাসের কথা শুনিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিলেন 'গু-ওটা জানে না—এত বড় স্পর্দ্ধা—সর্প মস্তকে হাত, হরিদাস বাবুকে বলে দিয়ে গুওটার সর্ব্বনাশ করব, জানে না, গুওটা পাপিষ্ঠ নরাধম। একি অন্য কারুকে পেয়েছে?' বলিতে বলিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ব্রাহ্মণী আগুণ খাইয়া বসিয়া আছে; মুখে ঝড় বহিতেছে। কন্যার মুখে ব্রাহ্মণী এ কথা শুনিয়াছেন জানিতে পারিয়া বাপান্ত-বাগীশ অধৈর্য্য হইলেন। বামা বলিল 'আমরা কারুকে ত কিছু বলিনি—এতে যদি এই হয়, নয় ছাদে যাব না।' জ্বলিত অঙ্গারের রাশিতে জল ঢালিয়া দিলে যেমন হয়, সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া বাপান্তবাগীশ বলিলেন 'পাষণ্ডি! তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনি! তুই গুওটি এ পাপের মূল। যথা-শাস্ত্র তোর দণ্ড বিধান না করিয়া কল্য যদি জল গ্রহণ করি, তবে আমার দশম পুরুষ যেন নরকস্থ হয়'। তৎকালের জন্য অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। তথাপি ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছিল। স্থিরভাবে বাপান্তবাগীশ এক সঙ্কল্প করিলেন; মস্তিষ্ক-বহিষ্কর এক গাছি লাঠির সংযোগ করিয়া শয়ন গৃহের এক কোণে রাখিয়া দিলেন

নরেন্দ্রনাথ যথাকালে সমাজে গেলেন। যখন বক্তৃতা হয়, তখন আমাদের দেশের দুর্দ্দশা, স্ত্রীগণের অধীনতাই যাঁহার দেদীপ্যমান সাক্ষী স্বরূপ—এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে নরেন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে সমাজের কার্য্য শেষ হইল। তখন আর কয়েকটী ভ্রাতা 'কৃষ্ণমোহন লাহিড়ীর কন্যা সমাজ গৃহ হইতে বাটী যাইতেছেন, সপ্তাহ কাল আর এখানে আসিবেন না' এই মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন; এবং ডাইনে বামে কে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। যিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন, তিনি দরজার পাশ থেকে কি একটা কাপড়ের ভিতর ঢাকিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ চক্ষের জল মুচিতে মুচিতে বাটী আসিলেন। তাঁহার সেই দিনকার ভাব দেখিয়া অনেকে বলিয়াছিল, তিনি শীঘ্র উপাচার্য্য হইবেন।

বাপান্তবাগীশ নরেন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা করিয়া দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলেন। তাঁহার তন্দ্রা আসিলে পর ব্রাহ্মণী একবার বাহিরে যান। যেমন ফিরিয়া আসিতেছেন, বাপান্তবাগীশ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং ঘরের কোণ হইতে লাঠি লইয়া বিক্রমের সহিত এক আঘাত বসাইলেন। সৌভাগ্য ক্রমে ব্রাহ্মণীর গায়ে আঘাত না লাগিয়া ব্রাহ্মণীর চুড়ির উপর দিয়া গেল।

'গুওটা মাতাল, বোতল হাতে ক'রে আমার বাড়ী! একি অন্য কারুকে পেয়েছ, গুওটা পাষণ্ড নরাধম,' এই বলিতেছেন, এমন সময়ে বাপান্তবাগীশের জ্ঞান হইল, যে তাঁহার ব্রাহ্মণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, নরেন্দ্র নহে। অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণীর মোহ ভঙ্গ হইল। কিন্তু বাপান্তবাগীশ প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'নরেন্দ্র কেন, নরেন্দ্রের চৌদ্দপুরুষ আসিলেও আর গায়ে হাত দিব না।'

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

শ্রীরামচন্দ্র যখন হনূমানকে মুক্তার হার প্রদান করেন, তখন মর্কটবর তাহার সমুচিত আদর না করিয়া ফেলিয়া দেন। বিভীষণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলেন যে 'বানরে হারের মূল্য কি বুঝিবে?' হনূমান উত্তর দিলেন 'যাহাতে রাম নাম নাই, তাহা আমার গ্রাহ্য নহে'। বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বলেন 'তবে শরীর কেন ধারণ কর, তাহাতে ত রাম নাম নাই?' হনূমান ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখাইলেন যে তাঁহার হৃদয় মধ্যে রাম নামের অভাব নাই।

গ্রন্থ লেখকগণ এক পক্ষে হনূমানের তুল্য। কাজের কথা ভিন্ন আমরা অন্য কিছু গ্রহণ করি না। অনেক পাঠক মনে মনে করেন, গ্রন্থ মধ্যে অমুক কথাটা থাকিলে ভাল হইত। কিন্তু সে বিষয় আমরা বেশী বুঝি বলিয়া উপরি লিখিত উপন্যাসটী তাঁহাদেব নিকট বলিতে হইল। উপমান উপমেয় বিষয়ে আমরা যে রূপ সতর্ক, তাহাতে

প্রত্যাশা রাখি পাঠক মহাশয়েরা আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন না।

আর এক পক্ষে, গ্রন্থ কর্ত্তারা শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ, পাঠকবর্গ 'মা যশোদা'। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের উদরে (কিম্বা মুখে—আমাদের বিশেষ স্মরণ নাই) যশোদা ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছিলেন। আমরা যতক্ষণ মুখ ব্যাদান না করি, ততক্ষণ পাঠকগণ কিছুই টের পান্ না। শুদ্ধ পাঠকগণ কেন?—অটোল বাপান্তবাগীশের বাটীতে রাত্রিতে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আমাদের ঘরের লোক নরেন্দ্রনাথও তাহা জানিতে পারেন নাই।

প্রভাতে উঠিয়া নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, বাপান্তবাগীশের ছাদের শিঁড়ির দরজা বন্ধ। বেলা হইল, তবু দরজা যেমন তেমনি থাকিল। নরেন্দ্রনাথ কেবল কিয়ৎকালের জন্য দরজার ভিতর দিকে ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনিলেন, কিন্তু জানিতে পারিলেন না যে বাপান্তবাগীশ ভিতর থেকে পেরেক্ মারিয়া জন্মের মত দ্বার রুদ্ধ করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীর সকলকে ছাদের উপর উঠিতে বিশেষ রূপ নিষেধ করিয়াও অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য উক্তরূপ কার্য্য করিলেন।

সেই দিন বিকালে, রামদাস বাপান্তবাগীশের বাটী আসিল। এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আকর্ণবিশ্রান্ত মুখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন মশায়! যা বলেছিলাম, তা হয়েছে কি না? কালেজের ছোঁড়া গুলাকে

একটুও বিশ্বাস করিবেন না। ওটা আবার বয়াটের সর্দ্দার —ব্রহ্ম সভায়——'।

রামদাসের কথা শেষ হইতে না হইতে ব্রাহ্মণ উগ্রচণ্ডা হইয়া উঠিল; বলিল, 'গুওটা নরাধম, পাষণ্ড, দানব-দলন, অকাল-কুষ্মাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড বেটা।—বেটা পাজি।—বেটা তোমার ঠাকুর কুকুর সমান, গুওটা মাতাল?—আমার সঙ্গে বিদ্রূপ—আমাকে অকথ্য কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ?—হরিদাস বাবুকে বলে দিয়ে তোর সর্ব্বনাশ কর্‌ব, জানিস্‌ নে, গুওটা দোর্দ্দণ্ড! একি অন্য কারুকে পেয়েছ?—প্রলাপ বাক্য ব'লে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত?—গুওটা মহিষাসুর—তোর কথায় তো কাল সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলাম। বেরো গুওটা বেরো—এখনি বেরো। এক দণ্ড যদি তিষ্ঠিবি তবে ভস্ম কর্‌ব, গুওটা জান না?' কি রূপে সর্ব্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বাপান্তবাগীশ ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। বাপান্তবাগীশের রাগ হইলেই কাপড় খুলিয়া যাইত, নচেৎ অদ্য রামদাসকে ধনঞ্জয় দেখাইতেন।

বেগতিক দেখিয়া দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া রামদাস সরিয়া পড়িল। এরূপ ব্যবহার রামদাসের অভ্যস্ত ছিল, সুতরাং বাপান্তবাগীশের বাড়ী হইতে সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই এ সমস্ত কথা রামদাসের মন হইতে সরিয়া গেল।

রামদাস নরেন্দ্রনাথের বাসায় উপস্থিত হইল। নরেন্দ্র পুস্তক সম্মুখে, দক্ষিণ হাঁটুর উপর দক্ষিণ গাল রাখিয়া বাপান্তবাগীশের শিঁড়ির দরজার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। রামদাসের হুহুঙ্কারে তাঁহার চৈতন্য হইল।

'না, তা কিছু নয়, কেও রাম বাবু আসুন আসুন—আজি বড় গরম, তাই একটু হাওয়া—'—এইরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ ঘুরিয়া বসিলেন, এবং ঠোঁট চাটিতে লাগিলেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে অগ্রহায়ণ মাসে এই ঘটনা হইতেছে; কলিকাতা হইলেও সেখানে ঋতুর অধিকার আছে, তবে প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প হইতে পারে।

রামদাস। 'বাবু, তোমরা 'মাইডিয়ার' লোক, তা ব'লে আমাদের ঘৃণা করিবেন না। কটাক্ষ রাখ্‌তে হয়, অধীন ব'লে মনে করিতে হয়, পায়ে ঠেল্‌তে নাই। রামকমল ডাক্তার বল্‌ত দশ ইয়ারের মজাই মজা। এসেছ, দু দিন মজা কর। লক্কা পায়রার মত ঘুরে বেড়াও—মাছের জলপিপি খাও আর রং দাও, রং দাও। হায় হায় হায়।' শেষোক্ত শব্দ কয়টী রামদাস প্রয়োগ করিতে বড় ভাল বাসিত, এবং বিশেষ ঘন করিয়া উচ্চারণ করিত। তাহার সংস্কার ছিল, এরূপ করিলেই রসিকতা হয়; অন্ততঃ মানুষ মাতী হয়। অনেক স্থলে কাজেও তাহাই ঘটিত।

নরেন্দ্রনাথ রামদাসের নিকট মুখ পাতিতে পারিতেন

না; তাহাতে মনে দুঃখ। উপদেশ দ্বারা সংসারের উন্নতি করিবেন, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আত্ম-ক্ষতিও স্বীকার করিবেন, নরেন্দ্রের এইরূপ অন্তঃকরণ,—এইরূপ শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলেই (তাঁহার) সমান জ্ঞান বিশিষ্ট নয়, এই সান্ত্বনা মনে ধারণ করিলেন, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামদাসের ভ্রমণ করিতে যাইবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পঁচিশ টাকা পুঁজি ছিল, রামদাসের কথায় তাহার পনর টাকা সঙ্গে লইলেন। বাহিরে গেলেন। বিধাতার পার্থিব সহকারী পাচক ঠাকুরকে বলিয়া গেলেন, তাঁহার নিমন্ত্রণ আছে, রাত্রে বাসায় আসিবেন না।

পর দিনও পূর্ব্ববৎ গেল। সমস্ত দিনমানে বাপান্ত-বাগীশের দ্বার খুলিল না। তখন শোক-ভারে (জানালার গরাদের ভিতর দিয়া যত দূর সম্ভব) নরেন্দ্রনাথের সে মুখচন্দ্র ঝুলিয়া পড়িল। দৃষ্টি গলির ভিতর পড়িয়া গেল। যাহা পূর্ব্বে দেখেন নাই তাহা দেখিতে পাইলেন; আনন্দে মুখ তুলিলেন। মুখ ঈষৎ বিস্তৃত হইল, গাল দুখানি সহজ অপেক্ষা ঈষৎ উচ্চ হইল। উপর পাটীর সম্মুখের গুটি কত দাঁতের মধ্যে স্থল দেখা গেল। এই সকল দেখা গেল, কিন্তু কেবল গ্রন্থকর্ত্তাই দেখিলেন, আর কেহ দেখিতে পাইল না। নরেন্দ্রনাথ মনে মনে একটী সঙ্কল্প করিলেন।

চরণ পঙ্কে নিমগ্ন হইল। নরেন্দ্র ভয়ে ওঁ আঁ করিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বাপান্তবাগীশ এত রাত্রিতেও কিজানি কেন উঠিয়াছিলেন। 'কেরে? গুওটা চোর বুঝি! ধর গুওটাকে! ধর বেটাকে!' শব্দ করিয়া উঠিলেন। নরেন্দ্র হাঁশ পাঁশ করিয়া পলাইতে লাগিলেন। যখন দক্ষিণ পদের ষ্টাকিঙের উপর জুতার পরিবর্ত্তে কর্দ্দম লইয়া নরেন্দ্র দৌড়িয়া পলাইতেছিলেন, তখন বাপান্তবাগীশ প্রদীপ লইয়া গলির মুখে দাঁড়াইয়া। নরেন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহাকে চেনা দূরে থাকুক, বাপান্তবাগীশের হস্তের প্রদীপ পড়িয়া গেল, এবং 'রাম! রাম! ত্রাহি ত্রাহি!' করিতে করিতে তিনিই পলাইয়া গেলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের শঙ্কা হইল, ভট্টাচার্য্য চিনিয়াছে। তিনি বাসার দিকে না ফিরিয়া উত্তর মুখে এক পায় জুতা লইয়া দৌড়িলেন। কতক দূর গিয়া জুতা ও ষ্টাকিং ফেলিয়া দিলেন, পরে পশ্চিম মুখে চলিয়া গেলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"উথলিল শোক পারাবার"।

বিশ্বনাথ ঘটকের স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর রাণাঘাটে বাস করিতেন। যুবা বয়সে একটু মন্দ অভ্যাস হওয়ারদোষে, তাঁহার পিতা থানার মুনশীগিরি করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, সমস্তই অল্পে অল্পে শেষ হইয়া যায়, এবং ক্রমে ক্রমে তিনি কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ঋণ পাওয়াতে অভ্যাস প্রবল হইল। পরিশেষে ঋণ পরিশোধের অন্য উপায় না দেখিয়া অগত্যা তিনি মহাজনের লেখার অনুকরণ করেন। কিন্তু বিচারালয়ের ভ্রম প্রযুক্ত তাঁহার চরিত্রে অন্যায় সন্দেহ আরোপিত হওয়াতে তাঁহাকে ঘৃণায় জম্বুদ্বীপ ছাড়িয়া যাইতে হয়। দ্বীপান্তরে দশ বৎসরকাল বাস করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন রাণাঘাটের দুশ্চরিত্রদিগের সহবাসে থাকা লজ্জাকর জ্ঞান করিয়া তিনি অগ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন। কিছু দিন পরে, তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন বিশ্বনাথের বয়ঃক্রম ষোল বৎসর। শঙ্করী নামে বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী চিরবিধবা, সুতরাং তাঁহারই স্কন্ধে পড়িল।

বিশ্বনাথ বাল্যকালে পিতৃবিরহ প্রযুক্ত সরস্বতীর সঙ্গে

ঘনিষ্ট আলাপ করেন নাই; সুতরাং পিতার কাশীগমনের পর উপায়হীন হইয়া একজন বাসনের মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাসনের দোকানে মাসিক তিন টাকা বেতন হইল, এবং মস্তকে বাসন করিয়া পাড়া করিতেন। এ অবস্থায় কিছু ক্লেশ বোধ হওয়াতে তিন চারি বৎসর পরে নিজের উপার্জ্জিত পাঁচ শত টাকা লইয়া স্বয়ং বাসনের কারবার আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বিবাহাদি হইল; এবং কালক্রমে দুই পুত্র জন্মিল। জ্যেষ্ঠের নাম মধুসূদন; কনিষ্ঠ, আমাদের পরিচিত নরেন্দ্রনাথ। বিশ্বনাথ বিদ্যায় এক প্রকার বঞ্চিত ছিলেন, সুতরাং পুত্রদ্বয় তাঁহার মত না হয়, এই অভিপ্রায়ে উভয়কেই গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখাইতে লাগিলেন। শেষে কারবার বাড়াইবার ইচ্ছা করিয়া কলিকাতা যান; তথা হইতে বহুতর বাসন (কিছু নগদ—অবশিষ্ট, ধারে) নৌকাযোগে আনিবার সময়, ঝড়ের সাহায্যে বিশ্বনাথ, বাসন, নৌকা, ধার, নগদ সমস্তই এককালে ভাগীরথীর উদরে জীর্ণ হইয়া গেল।

বিশ্বনাথের জলপথে পরলোক যাত্রার সংবাদ পাইয়া, মধুসূদন কিছু কাতর হইলেন। এবং সংসারের—অর্থাৎ পিসার এবং কনিষ্ঠের ভার তাঁহার উপর পড়িল দেখিয়া বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ভঙ্গ করিলেন, এবং সামান্য গোছের একটী চটের দোকান করিয়া সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন।

মধুসূদন খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, এবং তাহার চুল কাফ্‌রির মত, এই অপরাধে নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বিশেষ ভাল বাসিতে পারিতেন না। এরূপ সহোদরকে বারংবার 'পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়' বলিয়া পত্র লিখিতে ঘৃণা হইত, এই হেতু প্রতিবার বন্ধের পর বাটী হইতে কলিকাতা যাইবার সময়, যত দিন থাকিতে হইবে অনুমান করিয়া, খরচের টাকা একবারে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। পাছে নরেন্দ্রের কোন কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া মধুসূদনও যেমন করিয়া হউক সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

দুমাস আড়াই মাস অন্তরে নরেন্দ্রনাথ বাটীতে নিজ দেহের কুশল লিখিতেন। একবার, বহুকাল পত্র না পাইয়া মধুসূদন চিন্তাকুল হন, এবং পিসীর পরামর্শে নরেন্দ্রকে কলিকাতায় দেখিতে যান। নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে দুই দিবসের অধিক বাসায় থাকিতে দেন নাই, এবং বন্ধুবর্গের নিকট জ্যেষ্ঠকে বাটীর সরকার বলিয়া পরিচিত করেন, ইহা আমরা উত্তম রূপ জানি। নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি জ্যেষ্ঠের প্রতি অনিবার্য্য ঘৃণাকে হৃদয়ে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কি কি করিয়া অবশেষে কি রূপে সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে তদীয় শ্রীচরণ-দ্বয়কে কষ্ট দিয়াছেন। ঐ সমস্ত ঘটনার বহুকাল, এমন কি ৪।৫ মাস পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্রনাথ বাটীর কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে অগ্রাহয়ণ

মাস শেষ হইল, পরীক্ষার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি নরেন্দ্র বাড়ী আসিলেন না। ক্রমে পৌষ মাঘ মাস ও গেল। তখন মধুসূদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল। পিসী গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া প্রতিদিন বিকালে কান্না ধরিলেন।

'একে পিসী, তায় বয়সে বড়', সুতরাং শঙ্করী ঠাকুরাণীকে আমরা কখন নাম ধরিয়া ডাকিব না। পিসী অথবা পিসীমা বলিতে থাকিব। হে হৃদয়গ্রাহি পাঠক মহাশয়! যদি আপনার পিসী—অপনাদের 'পরমারাধ্য পরম পূজনীয়' পিতামহের চিরবিধবা কন্যা থাকেন, তবেই আমাদের ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

দিন যায়, রাত্রি আইসে; কিন্তু মধুসূদনের 'ভাই নরেন্দ্র' বাটী আইসে না। রাত্রি যায় দিন আইসে, কিন্তু পিসীমার 'নরেন্' ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির কেহ নাই, কাজেই তাহারা না চাইতে আইসে, না চাইতে যায়। আমাদের 'নরেনের' পিসী আছেন, সুতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে? ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পান না, তায়, পিসী কোন্ ছার?

মধুসূদন পিসীমার অনুরোধে তাঁহাদের গ্রামের গদিয়ান বাবুকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ জানিবার জন্য এক খানি সজল-নয়ন পত্র কলিকাতায় লিখিলেন। উত্তর আসিল যে অগ্রহায়ণ মাস অবধি গদিয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই।

তখন বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাক ঝাড়াতে উঠান্ সর্ব্বদা সপ্ সপ্ করিতে লাগিল; ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে লোণা হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্তা পিসী সর্ব্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশিনীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল।

পিসী মধুসূদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। মধু একবার মাত্র কলিকাতায় গিয়াছিলেন; তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছিল। এখন গবেশ বিদেশ গিয়াছেন; সুতরাং কলিকাতার গলির ভয়ে, বিনা গবেশ রায়ে, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না।

এক দিন রাত্রি-প্রভাতে পিসীমা ভারি-মুখ ভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাজ সারা হইল, স্নানে যাইবার জন্য তেলের বাটি গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; কিন্তু যাইতে পারিলেন না। পরচালায়, বাম হস্ত ভূমিতে পাতিয়া, দুই পা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

গ্রামের উত্তর পাড়ার একটী স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল, যে মধুর পিসী কাঁদিতেছেন। ইহার একটু কবিকল্পনা ছিল; পাড়াগেঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। 'ঘটকদের নরেন্দ্র কাল্ রেতে বাড়ী এসেছিল, সকাল বেলা তারে সাপে খেয়েছে, তাই তার পিসী কেঁদে গাঁ মাথায় করেছে' যাহাকে দেখে এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘটক-বাড়ী

অভিমুখে চলিল। যখন পঁহুছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য ; বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ডে আর স্ত্রীলোক নাই। সকলেই বলিতেছে 'অমন ছেলে হয় না, হবে না'। ইহারই মধ্যে কেহ আর এক জনের নিকট 'সুদের পয়সা কটা' চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমনি তাহার চক্ষু ছলছল, কে যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয় ; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর, যেন 'পিসীর' দুঃখের কথা তাহারা শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা এক-চিত্তে এক-ভাবে, বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্প বয়স্কা একটা স্ত্রীলোক—সেও কাঁদিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল 'বেটী বসে' কাঁদ্‌ছে, যেন আল-কাৎরা মাখান বড় চরকা ঘুরছে'।

একটু একটু কাঁদিয়া যখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন পিসীমা রোদনের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন, দুটা একটা কথা কহিতে লাগিলেন।

'আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে কি কারও হয়। ভাই মরেছে, সয়েছে। বলি, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুঃখ যাবে'—পিসীমা নাক ঝাড়িলেন, একটা স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে নাক তুলিয়া চলিয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে দুঃখ মোচন হইবে, তাহা আমরা জানি না। পিসী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের সম্ভবে না।

পিসী পুনশ্চ চীৎকার ধরিলেন; আবার কান্নার বেগ থামাইলেন, আবার কথা আরম্ভ হইল। 'নরেন্ আমার পিসীমা বৈ পিসী বলে না, এমন ছেলে কোথায় পাব? আর কি এমন হবে? নরেন্ তুই এক বার দেখা দে, আবার যাস্। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না, এখন আমি কোথায় যাই?'

নানা ছাঁদে বিনাইয়া পিসী কাঁদিতেছেন, কথা কহিতেছেন, আবার কাঁদিতেছেন; কিন্তু ইহার মূল কারণ কেহই কিছু জানিতে পারে না। অবশেষে এক জন বৃদ্ধা বলিল 'যা হয়েছে, তা ফের্‌বার নয়, এখন তোমার মধু বেঁচে থাকুক, আশীর্ব্বাদ কর। কপালে যা ছিল, হ'ল; কাঁদ্‌লে কি হবে। শুন্‌লে কবে? এ দারুণ কথা ব'ল্লে কে, কেমন ক'রেই বা ব'ল্লে?'

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন 'ষাট্! ষাট্! বুড়ীর দাস আমার! তা কেন হবে? ছেলের খপর পাই নাই, তায় রেতে স্বপন দেখেছি, তাই বড় ভাবনা হয়েছে।'

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, একথা তখন জানিতে পারিয়া দুই জন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। পিসী তখন স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

'নিজের ভাল দেখিলে মন্দ হয়' তাহাতেই পিসীর এত শোক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। রাত্রি-শেষে পিসী স্বপ্ন দেখেন যে মুলুকের ছোট লাট সাহেব মরেছে, তাতে লাট-

হস্তী ক্ষেপে বেড়ায়। পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শুঁড়ের দ্বারা মস্তকে তুলিয়া লইয়া গিয়া লাট-সিংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে। তাহাতে পিসী মা বলিলেন 'জাত যা'ক তবুও বউ নিয়ে ঘরে এস'—নরেন্দ্রনাথ এল না। তখন পিসী নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্দ্র হাত ছাড়াইয়া লইল, অমনি পিসীর নিদ্রাভঙ্গ।

ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দুঃখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইতে গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য্য সারা, গুণ্ গুণ্ স্বর হইতে পরিশেষে পা ছড়াইয়া চীৎকার ধ্বনিতে কান্না ও পাড়ার লোক জোটা।

অনেক প্রবোধে পিসীমার কান্নার 'ইতি' হইল। আমরাও পাঠক বর্গকে বিরাম দিবার জন্য পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতা।

এদিকে পিসীর রোদন, তাহাতে নিজের মনের টান, মধুসূদন সহোদরের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাটী হইতে একাকী বিদেশ যাওয়া কি রূপে হইতে পারে? গ্রামে এমন কোন উপযুক্ত কি সাহসী লোক নাই, যে মধুসূদন তাহাকে সঙ্গে লন; তবে উপায় কি? ভ্রাতার অনুসন্ধান না করিলেও নয়।

আহার করিতে বসিয়া মধুসূদন এই প্রকার ভাবনা করিতে লাগিলেন। সে দিন ব্যঞ্জনের সুবিধা ছিল না; কিন্তু মনের দুর্ভাবনায় সে বিষয়ে ভাবে কে? মধুসূদন ভ্রাতৃচিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া অগত্যা দুই বারের অন্ন একাসনেই উদর-গত করিয়া ফেলিলেন। তথাপি তিনি যে আহার করিলেন, এরূপ তাঁহার বোধ হইল না। হায়! এমন সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা যদি কিছু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ!

সুখ যেমন চিরদিন থাকে না, দুঃখও সেইরূপ। যদি উপর্য্যুপরি ছয় মাস দিন হয়, তাহা হইলে, ছয় মাসকাল

রাত্রিও হইবে। এখন যে স্থানে রৌদ্র, সময়ান্তরে সেখানে অবশ্যই ছায়া হইবে। অদ্য যে ঘরে আগুন লাগিল, এক দিন না এক দিন, অবশ্যই তাহার উপর বৃষ্টিপাত হইবে। ফলতঃ সকল অবস্থারই পরিবর্ত্তন আছে। কল্য পরের লেখা পড়িতে পড়িতে আমার মুখের জল শুষ্ক হইয়া মুখে ধূলি উড়িতেছিল বলিলেই হয়, আজি আবার আমিই গ্রন্থকার—মহারাজ চক্রবর্ত্তী; পাঠক! পাঠক! করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কান ঝালা পালা করিতেছি, কাহারও কথাটী কহিবার যো নাই। অবস্থা পরিবর্ত্তনের এতদপেক্ষা সাধুতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

মধুসূদন আহার সমাপন করিয়া তিন ছিলিম তামাক মাটী করিলেন, তথাপি ভাবনার কূল পান না। এমত কালে, শ্রীযুক্ত গবেশচন্দ্র রায় আসিয়া উপস্থিত। হাবুডুবু খাইতে খাইতে পদ্মার জলে ভাসিয়া যাইবার সময়, তূলার বস্তা পাইলে যেমন সুখ; অন্ধকার গলি-রাস্তার ভিতর, লাণ্ঠান হস্তে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গ পাইলে যেমন সুখ; নিদ্রিত গৃহস্থের দ্বার অনর্গল পাইলে, চোরের যেমন সুখ; মালিনীর সহিত আলাপ হইলে সুন্দরের যেমন সুখ; বাড়ীর সম্মুখে শুঁড়ির দোকান প্রতিষ্ঠিত হইলে, মাতালের যেমন সুখ; এবং পরের ব্যয়ে পুস্তক প্রচারিত হইতে পারিবে, ইহা শুনিতে পাইয়া গ্রন্থকার বিশেষের যেমন সুখ; গবেশ রায়কে পাইয়া মধুসূদনের তদপেক্ষাও

অধিক সুখ হইল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আবশ্যক হইলে গবেশ রায় যমপুরেরও বার্ত্তা আনিয়া দিতে পারেন।

বাস্তবিক গবেশ রায় যে একজন অসংসাহসিক লোক ইহা তদীয় মূর্ত্তি দর্শনেই প্রতীয়মান হয়। মস্তকের কেশ হৃষ্টপুষ্ট, যেন যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত, কোন রকমে শূকর-কেশর-সম্মার্জ্জনীর শাসনে অল্প প্রতিনিবৃত্ত। চক্ষু দুটী প্রকাণ্ড, যেন পান্‌শী নৌকার পিতলের চোক্। কানের পরিবর্ত্তে, কে যেন দুর্গা-প্রতিমার হস্তস্থিত পিতলের ঢাল কাড়িয়া লইয়া দু আধ খান করিয়া মস্তকের দুই ধারে বসাইয়া রাখিয়াছে। গালের মাংস সরিয়া গিয়া নাকে যোগ দিয়াছে, সুতরাং নাকটী যেমন চিতল মাছের পিঠ। গোঁপের নীচে দাঁত, দাঁতের নীচে চিবুক। ঠোঁট ভিতরে ভিতরে আছে, কিন্তু দেখা যায় না। গণ্ডারচর্ম্মী গবেশের দেহে অস্থি থাকাতে শরীর যেন ঢেউ-খেলান। বর্ণ পিতলের মত। গবেশ রায় না বেঁটে না লম্বা।

কালাপেড়ে ধুতি পরা, নিমুর পিরাণে গলা অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত, এবং হাতের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত আবৃত, পান চিবাইতে চিবাইতে গবেশ রায় মধুসুদনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তামাক খাইতে খাইতে গবেশ আপনা হইতেই বলিলেন 'এর জন্য ভাবনাটা কি? কচি ছেলে নয় যে কেউ হাতের বালা কেড়ে নেবে। তবে, এত দিন খবর পাও নাই, এই কথা। কিন্তু তার স্বভাব ত জানই। কল্-

কাতা সহর, কোথায় কোন বয়াটের দলে ভর্ত্তি হয়েছে আর কি? যদি তোমার এতই ভাবনা হইয়া থাকে, আমায় বল্লেই হ'ল, যেখানেই থাকুক, খুঁজ্‌লে বেরোবেই বেরোবে।'

মধুসূদন। 'যাই হউক, একবার অনুসন্ধান করা আবশ্যক; কিন্তু জানই ত, সে বিষয়ে তুমিই আমার ভরসা। একা যেতে পারিব না, তাই তোমার প্রতীক্ষায় তীর্থের কাকের মত বসেছিলাম; বলি, গবেশ বাড়ী এলে, অবশ্যই আমার এ উপকার করিবে। তুমি পৌঁছিলে কখন?'

গবেশ রায় স্বর গম্ভীর করিয়া বলিলেন 'এই মাত্র বাড়ী এসেই মামার কাছে শুনিলাম, নরেন্দ্রনাথের কোন সংবাদ না পেয়ে, তোমরা বড় চিন্তিত আছ, আর পিসী আজ্‌কে কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র করেছে। অমনি এলাম, বলি দেখে আসি।' প্রকৃত পক্ষে গবেশ রায় বাটী পৌঁছিয়াই এ কথা শুনিতে পান; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মধুসূদনের নিকট না আসিয়া স্নান আহার সমাপনান্তে, একটু যৎসামান্য নিদ্রার পরেই এখানে উপস্থিত হইতে যে সামান্য বিলম্ব হইয়াছিল, এই মাত্র।

গবেশচন্দ্রের পিত্রালয় বনবিষ্ণুপুর। অতি শিশুকালে, তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হওয়াতে মাতুলালয়ে অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ছেলে বেলায় গবেশের যাহাতে সাধ হইত, ইহাঁর মাতুলেরা তৎক্ষণাৎ তাহাই দিতেন। গবেশ যখন কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিবেন, সেই সময়ে

গুরুমহাশয় এক দিন তাঁহাকে প্রহার করাতে, মাতুলগণ গবেশকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লন। সুতরাং গবেশ-চন্দ্রের সরস্বতী 'পাতা' ছাড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ নিকটবর্ত্তী গ্রামের এক জন কৃতবিদ্য ভদ্র-লোকের সহিত তিন চারি দিন ক্রমাগত আলাপ হওয়াতে, গবেশচন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের সরস্বতীকে জয় করিলেন। ইংরাজী ইংরাজদের বিদ্যা, এই পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ করিয়াই সেক্সেপি-ওরের লেখার গুণাগুণ বিচার; দুই বার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া-ছিলেন সেই বলে কালিদাসের কবিত্ব সমালোচন, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া গবেশচন্দ্র হঠাৎ একজন দুর্দ্দান্ত 'ভদ্রলোক' হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ যেমনই কেন প্রসঙ্গ উপস্থিত হউক না, গবেশের তাহাতে কিছু না কিছু বক্তব্য থাকিবেই। একে বাল্যকালের আদুরে ছেলে, তাহাতে এইরূপ ভদ্র লোক হইয়া উঠাতে, গৃহে অন্নাভাব সত্বেও শ্রমকাতরতা, ধোপার পয়সা সংস্থানের ক্ষমতা না থাকিলেও মলিন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মোটা বস্ত্রাদির উপর ঘৃণা, ইতর লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তৃতীয় পক্ষ দ্বারা শুঁড়ির সহিত সম্পর্ক, প্রভৃতি বাঙ্গালী ভদ্রত্বের সমস্ত অঙ্গ গুলিই তাঁহাকে পাইয়া বসিল।

গবেশচন্দ্র কেবল ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য মধুসূদনের নিকট গিয়াছিলেন। সুতরাং মধুসূদনের অনুনয় বিনয় দেখিয়া তাঁহাকে অগত্যা বিরক্ত হইতে হইল।

বলিলেন 'এক্ষণ তোমাদের ভাবনা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কোন কাজের নয়। দুদিন গেলেই সারিয়া যাইবে। বিশেষতঃ যে ভয়ঙ্কর রৌদ্র, আজি কালি বাড়ীর বাহির হওয়াই দুষ্কর।' নাটক অভিনয়ের একটা দল হইবে শুনিয়া এই রৌদ্রে গবেশচন্দ্র কালনায় গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়াছেন, একথা তিনি মনে করিলেন না; মনে করি-লেও, এখন দুই এক দিন পুনরায় পথ হাঁটিতে কষ্ট হইবে, এরূপ অলীক আপত্তি করা তাঁহার বিবেচনায় ভাল বোধ হইল না। এই জন্যই রৌদ্রের ওজর করিলেন।

মধুসূদন নিরুপায়। মুখের কথায় যদি কাজ হইত, তবে গবেশের সাধ্যপক্ষে ক্রটি ছিল না। কিন্তু বিধির বিপাকে উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা হইতে পারে না; মধুসূদন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিবিষ্ট অভাব চিত্তে অন্য উপায়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তামাকের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল; উপকার করিতে পারিবেন না মনে করিয়া গবেশচন্দ্র দুঃখিত-হৃদয়ে একখানি আসনের উপর বসিয়া থাকিলেন।

উভয়ে নীরব; কিন্তু বাক্য বিষয়ে কৃপণতা মানুষ মাত্রেরই হয় না, বিশেষতঃ গবেশের মত মানুষের। অতএব গবেশ কিয়ৎক্ষণ পরে একটা পান চাহিয়া শান্তি ভঙ্গ করিলেন। মধুসূদন ভাবিবার বিষয় পাইয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। গবেশ যাইতে স্বীকার না করাতে তাঁহার চিত্ত আলকাৎরার ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল; সেই গবেশ

আবার পান চাহিল, ইহাতে তাঁহার মনে যেন ঝাড়ের আলো হইল। "পান? শুধু পান? কেন, জল খাবে না?" মহাব্যস্তে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন। গবেশ বাধিত হইলেন। "খেলেই হ'ল" বলিয়া মধুসূদনকে অনুগৃহীত করিলেন। এ সংসারে কত জন যে এইরূপে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, গত লোক সংখ্যাতে তাহার কি কোন নিদর্শন আছে? না থাকিলে, থাকা উচিত।

মধুসূদনের সুপারিশ মত পিসীমা জলখাবার আনিয়া দিলেন। যেই গবেশের সম্মুখে আসিয়াছেন, অমনি পিসীর নয়ন-সমুদ্রের লবণাম্বু দু ফোটা জলাধারে পড়িল। ভাগ্যে গবেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না! পিসী খাদ্য-সামগ্রী ভূমিতে রাখিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

"আহা! বাছা আমার কোন দৈবে পড়েছে! তা না হ'লে কি এমন হয়? নরেনের সকল এক দিক, আমি এক দিক। সে কি অভাগীকে সাধ ক'রে দুঃখ দেবে? ওরে মধু, বাবা তুই যা, আমার নরেনকে এনে দে। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না, নইলে আমার কি সাধ আর বাঁচতে। বাবা গবেশ, তুমি নয় একটু দুঃখ সও, আমার আঁধারের মাণিক এনে দাও। গবেশ বড় ভাল ছেলে, গবেশ কি আমার কষ্ট চেয়ে দেখ্‌বি না? বাপ আমার, তুমি কত দূর-দূরান্তর দেশ দেখেছ, এ তোমারই কাজ। তুমি সে দিন কার ছেলে, তবু এই বয়সে কত দেশ দেখ্‌লে;

একবার কল্‌কাতা দেখেছ, দু বার কালনা দেখ্‌লে, কাটোয়া ত হাতের মুটে। বাবা এ তোমারই কাজ। আমার মাথা খাও, আমার কথা রাখ। যদি পয়সা থাক্‌ত, পাল্কী ক'রে দিতাম। তা কোথা পাব? আমার মরা মুখ দেখ, মধুর সঙ্গে যাও, তুমি যা নেবে মধু তোমায় তাই দেবে, নরেন্দ্রের দেখা পেলেই তারে নিয়ে বাড়ী ফিরে এস, তাতে আমি কিছু মনে কর্‌ব না, তুমি আমায় প্রাণদান দাও।"

ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়শাস্ত্র একত্র করিয়া তুলাদণ্ডের এক দিকে রাখিলে যত ভারী হয়, গণেশের চক্ষে "তুমি যা চাবে মধু তাই দেবে"—পিসীর এই যুক্তি তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক ভারী বোধ হইল। গণেশ ভাবিলেন "এমন অবস্থায় পরের উপকার করা নিতান্তই আবশ্যক। বিশেষ, যখন কলিকাতা যাইতে হইবে, তখন এমন সুযোগ ছাড়া যাইতে পারে না। পরের ব্যয়ে দু দিন পেট ভরিয়া ইয়ারকী দিতে পারিলে মন্দ কি? সেখানে আবার দশ জন ভদ্র লোক আছে। এ পাড়াগাঁয়ে কেবল গাছ, আর ধূল আর গরু, মানুষ ত নাই। পথে একটু কষ্ট, হইল হইলই। যাব" মনে করিয়া গণেশ সম্মত হইলেন; বলিলেন "তুমি (অর্থাৎ পিসীমা) যখন বলিতেছ, তখন আমার আপত্তি করা সাজে না। মধু তুমি নেহাত ভ্যাবা গঙ্গারাম, এই কলিকাতায় যেতে তোমার সাহস নাই; তুমি ক'রে খাবে কিসে, আমি ত

বুঝতে পারি না"। এই সারগর্ভ উপদেশ কটাক্ষের সহিত মধুকে দিয়া গবেশচন্দ্র "পরশ্ব" যাইবেন, স্থির করিলেন।

উভয়ে বাটী হইতে নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে বাহির হইলেন। কতক দূর গিয়া গবেশ বলিলেন "আমার সকালে কিছু খাওয়া অভ্যাস আছে"। মধুসূদন যাহা পাইলেন, কিনিয়া দিলেন। বেলা দশটার সময় উভয়ে এক চটীতে পৌঁছিলেন; গবেশ আর রৌদ্রে হাঁটিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার ফরমাএশ মত মধুসূদন তাঁহাকে পাকাদি করিয়া খাওয়াইলেন। আহারান্তে বিশ্রাম।

বেলা পড়িল; দুই জনে আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক গ্রামে পৌঁছিয়া গবেশ অন্ধকারের আশঙ্কা করিয়া সেই খানেই রাত্রি বাসের প্রস্তাব করিলেন। মধুসূদন সম্মুখ-জ্যোৎস্না সত্ত্বেও সুতরাং দ্বিরুক্ত না করিয়া এক দোকানে বাসা লইলেন। গবেশের "অভ্যাস" ভঙ্গ ভয়ে গ্রাম খুঁজিয়া দুগ্ধ আনিয়া দিলেন; রাত্রিতে পাকাদিও করিয়া দিলেন। দোকানী শয্যার নিমিত্ত একখানি মাদুর দিল। গবেশের তাহাতে "ঘুম হইবে না" এই জন্য মধুসূদন নিজের সমস্ত বস্ত্রাদি দিয়া তাহার শয্যা রচনা করিয়া দিলেন; আপনি একপার্শ্বে "অর্দ্ধ-গঙ্গাজলীর" ন্যায় পড়িয়া সঙ্গ-সুখের বিষয় সমস্ত-রাত্রি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অগ্রদ্বীপ হইতে মেমারি যাইতে তাঁহাদের পাঁচ দিন

লাগিয়াছিল। পথে গবেশের অত্যন্ত কষ্ট হয়। গবেশ ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কষ্টে আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। (ইতি গোবিন্দ অধিকারী)

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"যাকে রাখ, সেই রাখে।"

বেলা এক প্রহরের সময় মধুসূদন ঘটক ও গবেশচন্দ্র-রায় মেমারি পৌঁছিলেন। কলিকাতার গাড়ী আসিবার বিলম্ব আছে জানিতে পারিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী দোকানে ক্ষণকালের জন্য বাসা লইয়া গবেশের পরামর্শ অনুসারে মধুসূদন তাড়াতাড়ি মাছের ঝোল ভাত পাক করিলেন, এবং বকপক্ষবৎ শুভ্র তরল দধির সহায়তায় ভাত কটা নাকে মুখে গুঁজিলেন। গবেশ রায়ের অন্নরসে অত্যধিক

প্রবৃত্তি ছিল। "তিন্তিড়ী ঘ্রাণ মাত্রেণ অন্নং চলতি পঙ্কবৎ" গবেশচন্দ্র যখন তখন এই কবিতার্দ্ধ আওড়াইতেন; এই জন্য দধির কথা আমরা বিশেষরূপে উল্লেখ করিলাম, রেলওয়ে ষ্টেশনের ধারে সচরাচর কি রূপ জিনিশ পাওয়া যায়, তাহা দেখাইবার জন্য নহে।

ভোজন সমাপনান্তে, পান চিবাইতে চিবাইতে দুই জনে দ্রুতগতি ষ্টেশনে চলিলেন, গবেশ রায় কষ্ট বোধ করিতে করিতে; এবং মধুসূদন, কি ভাবিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে। ষ্টেশন গৃহের বাহিরে গিয়া দুই জনে বসিলেন; সেখানে আরও অনেক গুলি যাত্রী বসিয়া রৌদ্র এবং তামাক খাইতেছিল। গবেশ মধুসূদনকে বলিলেন "মোট সাবধান"। ইহাঁদের সঙ্গে বস্ত্রাদি যে কিছু ছিল, একটী মোট করিয়া মধুসূদনকে তাহার সমুদয়ই লইতে হইয়াছিল। "মধু ভ্যাবা গঙ্গারাম, কে ঠকাইয়া লইবে" বলিয়া সঙ্গের টাকা কয়টী ও এক গাছি ছড়ি গবেশ লইয়াছিলেন। গবেশ মধুসূদনকে পুনরায় বলিলেন "তামাক খাবে ত কলিকাটা চেয়ে নাও না কেন?" পিসীর শাসন-বাক্য অনুসারে মধুসূদম গবেশের "যে আজ্ঞা" চাকর, এক জনের নিকট কলিকা চাহিয়া লইলেন; গবেশ আগে খাইলেন, পরে গবেশের অনুগ্রহে মধু, ও বঞ্চিত হইলেন না। গবেশচন্দ্র আবার মোটের বিষয়ে মধুকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সময় কাহারও হাত ধরা নয়; সময় রেলের গাড়ী অপেক্ষা দ্রুত চলে, সুতরাং সময় গাড়ীর অপেক্ষা করে না, গাড়ীই সময়ের অপেক্ষা করে। সময়ের শাসন-ক্রমে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। সেনানীর তূরিধ্বনি শুনিলে যেমন সৈন্যগণ যে যেমন অবস্থায় থাকুক তৎক্ষণাৎ সসজ্জ হইয়া দাঁড়ায়, ঘণ্টার শব্দ মাত্রে যাত্রিগণের মধ্যে সেই রূপ, গৃহ প্রবেশের জন্য একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। টিকিটের ঘরে টিকিট আদান প্রদানের জন্য একটী ছোট দ্বার কাটা থাকে; সেইটি যেমন উদ্ঘাটিত হইল, অমনি একটা মৃত-দেহ পাইলে শকুনির পাল ও গঙ্গাতীরের শৃগাল কুকুরের ন্যায় ইতর ভদ্র সকলেই সেই দ্বারের দিকে ঝুঁকিল,—অগ্রে টিকিট লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত; একটী ছেলে, লোকের চাপে কাঁদিয়া উঠিল; এক জন প্রাচীন, যাত্রিদের পায়ের নীচে পড়িয়া গেল, অপর এক জন "ছোট লোক" তাহাকে টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইল।

সকলে যে সময়ে বাহিরে বসিয়াছিল, তখন মধুসূদন কৌতূহল-পরবশ হইয়া তারের ঘরে তারের খবর দেখিতে গিয়াছিলেন। তারের বাবু সে সময়ে বেঞ্চের উপর চাদর মুড়ি দিয়া নিদ্রিত ছিলেন, মধুসূদনের প্রবেশ মাত্রে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। মোট হাতে মধুকে দেখিয়া রক্তিম-লোচন বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; বলিলেন "কে তুমি?" মধু বলিলেন "আজ্ঞে এই দেখ্‌তে এসেছি।" "আপন

বাড়ী গিয়ে দেখ” এই মিষ্ট বিদায় দিয়া মধুকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য, বাবু এক জন প্রহরিকে ডাকিয়া বলিলেন।

কতকটা এই অপমান স্মরণ করিয়া, কতক টিকিট চাহিবার পাঠ না জানাতে, কতক বা আপনা হইতে গবেশের ক্ষমতা ও সাহস অধিক জানিয়া মধুসূদন টিকিট লইবার সময়, রাধিকার মানের সময় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, চোরের মত মোটটা হাতে করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গবেশ টিকিট লইতে সেই ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট গেলেন। “কলিকাতার দুখান” বলিয়া একটী টাকা ও একটী দু আনী হাত বাড়াইয়া দিলেন। টিকিট বাবু সংগৃহীত টাকার মধ্যে গবেশের টাকাটী ফেলিলেন। গবেশকে বলিলেন “আরও চাই”। গবেশ শশব্যস্ত হইয়া মধুকে ডাকিতেছেন, এমন সময় “এ দু-আনী চলিবে না” বলিয়া টিকিট বাবু ক্ষুদ্র দ্বার পার করিয়া সগর্ব্বে দু-আনী ফেলিয়া দিলেন। অল্পপ্রাণা দু-আনী মনের দুঃখে গবেশের হাত ছাড়াইয়া অন্যান্য টিকিট গ্রাহিদের চরণতলে শরণ লইল। মধুকে ডাকিবেন কি, গবেশচন্দ্র দু-আনীর উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দেহ বক্র করিয়া হেটমুণ্ডে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ যাত্রিগণ টিকিট লইতে লাগিল, গবেশ ততক্ষণ দু-আনী পাইলেন না, কিন্তু মুখও তুলিলেন না। সকলের টিকিট লওয়া হইলে ক্ষুদ্র দ্বার রুদ্ধ

হইল। গবেশ দু-আনী পাইলেন, কিন্তু হায়! মুখ তুলিয়া দ্বার খোলা পাইলেন না। তাঁহার টাকাটী লক্ষ্মীর চঞ্চলতা দেখাইবার জন্য ঘরের ভিতর রহিল। মোট হাতে মধুসূদন বিনা বাক্য-ব্যয়ে এক পাশে যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনি রহিয়া, পিসীর অনুশাসনের শোধ তুলিতে থাকিলেন "নির্ব্বাত-নিষ্কম্পামিব প্রদীপম্"।

"আট পয়সার ফলার করিতে গিয়া আট আনার ঘটীটা ফেলে আসা" যেমন, গবেশচন্দ্র তদবস্থ হইয়া ষ্টেশনের ভিতরে প্লাট্‌ফর্ম্মে (নির্জ্জলা বঙ্গজ্ঞ! এ শব্দটীর ব্যবহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন) যাইবার জন্য দ্বারের নিকট যেই গেলেন অমনি এক জন প্রহরী "টিকিট কাঁহাঁ" করিয়া উঠিল, তিনি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বরং তাহার গাত্রে কিঞ্চিৎ বলপাত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মধুসূদনও এই বার স্থান-ভ্রষ্ট হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া গবেশের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কিন্তু, নির্দ্দয় দ্বাররক্ষক! গবেশের যত্নে তাহার হৃদয়ে যে রাগের সঞ্চয় হইয়াছিল, ভাল মানুষ মধুর উপকারার্থে দ্বারবান্ তাহা ব্যয় করিল। মধুর মোটে হাত দিয়া বলিল "ওজন্ নেহি হুয়া, মৎ যাও" যুক্ত দুটো মিষ্ট কথা। অগত্যা মধুসূদন গবেশের মঙ্গলাভের দুরভিসন্ধি কিয়ৎকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন; দু পা সরিয়া যথাপূর্ব্বস্থানে মোট হস্তে রাসের ছবির মত এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান

রহিলেন। ও দিকে গাড়ী আসিল, যে পারিল সে চড়িল; এক জন ষ্টেশন প্রহরী ধাক্কা দিয়া দুটী স্ত্রীলোকে গাড়ী চড়া বিষয়ে সাহায্য করিল, তাহাদের একটী বোচকা গাড়ীর নীচে রেলের উপর পড়িয়া গেল, কেহ তাহা তুলিয়া দিল না; গাড়ী সময়ের অনুরোধে শুভাশুভ কাল বিবেচনা না করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল।

যাহাদের রেলওয়ে গাড়ীতে যাওয়া অনিবার্য্য তাহারা যেন ভিক্ষা করিয়াও একটী পেণ্টালুন আর একটী কোট (তদভাবে ছোট, কাল রঙ্গের চাপ্‌কান) সংযোগ করিয়া রাখে; একটী সোলার টুপি হইলে "চূড়ার উপর ময়ূর পাখা" হয়; আমরা এই উপলক্ষে পাঠক অপাঠক সকলকেই এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া রাখিতেছি। আমাদের কথায় অবজ্ঞা করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে ক্রুটি করেন, প্রতিফল হাতে হাতে। আমরা দোষে খালাশ। মধুসূদন ও গবেশচন্দ্র এই মহা-বাক্য শুনেন নাই অথবা জানিতেন না, এজন্য তাঁহাদের যে দশা, তাহা আমাদের পক্ষে পোষক নজীর। এই উপলক্ষে আর একটী আমাদের আপন গরজের কথা বলিবার সুযোগ উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং আমরা সে সুযোগ ছাড়িতে পারি না। যাঁহারা এই গ্রন্থের সমালোচনা করিবেন, তাঁহারা নিন্দাই করুন বা ভৎসনাই করুন, ইত্যাদি, এই স্থলটী যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক উদ্ধৃত করেন। তাহা হইলেই উল্লিখিত উপ-দেশ বাক্যের খাতিরে, অনেকে এই পুঁথি কিনিতে পারেন।

আমরা শাস্ত্রীয় উপমার পক্ষপাতী, এই হেতু তদ্রূপ উপমা হস্তগত হইলে তাহা সুসংলগ্ন হইবে কি না, এ সন্দেহে মস্তিষ্ক চালনা করিতে ভাল বাসি না। আপাততঃ একটীর প্রয়োগ আবশ্যক হওয়াতেই এই ভূমিকা। হনূমান লঙ্কা দগ্ধ করিয়া, পরে আপনার মুখ পোড়ান। গবেশ রায় লঙ্কা পোড়াইতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ পুড়িল। তাহা এইরূপে।:

গাড়ী চলিয়া গেলে গবেশচন্দ্র ষ্টেশন বাবু বা টিকিট বাবুকে ধরিয়া বসিলেন। "কি মশায়! আমি টিকিট্‌ও পেলেম না, গাড়ীও বেরিয়ে গেল, এখন কি করি বলুন দেখি? যা হ'ল, তা হ'ল, এখন আমার টাকাটী ফেরত পেলে, রাত্রি পর্য্যন্ত বাজারে গিয়ে অপেক্ষা করি। যা হয় করুন, মশায়, আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারি না।" ষ্টেশন বাবু বলিলেন "তোমার টিকিট কৈ?" গবেশ বিস্মিত হইলেন; "টিকিট কিসের? আপনি টিকিট দিলেন কখন? টিকিট গেল, টাকাটী পেলে যে বাঁচি; এ বেলা যাওয়া ত বিলক্ষণই হ'ল।" ষ্টেশন বাবু এ কথায় উত্তর দিলেন না। এক জন প্রহরিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, যে গবেশের নিকট রাণীগঞ্জের ভাড়া আদায় না করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া না দেয়। গবেশকে লইয়া প্রহরী সেইখানে বসাইয়া রাখিল। মধুসূদনকে লইয়া হতবুদ্ধিদেব তাঁহার মোটের নিকট বাহিরে বসাইয়া রাখিলেন। ষ্টেশন বাবু এক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে ষ্টেশন বাবু প্রবেশ করিলেন, আর কয়টী বাবু ক্রমে ক্রমে সেই ঘরে আসিয়া যুটিলেন। যথাকালে তবলার চাটি ঘরের ভিতর উঠিতে আরম্ভ হইল; যথাকালে সেই কুঠরী হইতে রমণীকণ্ঠ আসিয়া গবেশের চিত্তটী চুরি করিয়া লইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতে প্রহরির হস্তে গবেশ-চন্দ্র দেহ হারাইয়াছিলেন, এখন মনটীও গেল। গবেশের থাকিয়া না থাকা হইল।

যদি গবেশের শরীরে শরীর রহিল না, মনে মন রহিল না, তবে তাহার লজ্জা, মান, ভয়, কিরূপে থাকিবে? স্থান, কাল, পাত্র সকলই ভুলিয়া গিয়া, মল্লার রাগের ফল যে বৃষ্টি, বৃষ্টির ফল যে ভেকসংগ্রহ, ভেকসংগ্রহের ফল যে ইংরাজী যন্ত্র বিশেষের শব্দ বিশেষ, সেই শব্দকে নিন্দা করে যে স্বর, সেই স্বরে গবেশরায় প্রহরির শাসনকে নিমগ্ন করিয়া "ওরে বিধি তোরে যদি বিরলেতে পাইরে" ইত্যাদি সুমধুর গান ধরিলেন। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের (আবার সেই শব্দ) টিন লোহার ছাদ ভেদ করিয়া গবেশের স্বর উঠিল; স্বর দিগন্ত ব্যাপিল; স্বর ষ্টেশন বাবুদের কেলিকুঞ্জে—রাস মন্দিরে প্রবেশ করিল। রসে ডগমগয়মান একটী বাবু ঘর হইতে গবেশের সমীপে চুম্বকে লোহবৎ আকৃষ্ট হইলেন। বাবু আসিয়া বলিলেন "অন্ধের যষ্টি, নির্ধনের ধন, আঁধারের মাণিক, গোবরের পদ্মফুল, তোমায় আমি এত ক্ষণ দেখিতে পাই নাই? আমার অপরাধ ক্ষমা কর, ঘরে

চল। তুমিই আমার উপায়, তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার অবলম্বন” এই বলিয়া বাবুটী গবেশের গলা জড়িয়া ধরিলেন। গবেশের তখন পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হইল; বাবুকে বলিলেন “আমায় কয়েদ ক’রে রেখেছে, আমার সঙ্গের এক জনকে কোথায় তাড়িয়ে দিলে তাও জানি না।” বাবু বলিলেন “তোমার আবার সঙ্গ? সঙ্গের অভাব কি? আমি তোমার সঙ্গ, তুমি আমার সঙ্গ”। বাবু গবেশকে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রহরিকে বলিয়া গেলেন “বাবা, শিকারে তোমায় বঞ্চিত করিতে চাই না; আমার এই দেবদেব মহাদেবের যে সঙ্গী বাহিরে আছে; তারে তুমি খুঁজে আন, আপনার কাছে বসিয়ে রাখ। এবারকার মত যা হ’ল, আর আমি চাইলেও ছেড়ে দিও না, কোন শালা চাইলেও ছেড়ে দিও না।”

প্রহরিও তাহাই করিল। বাহিরে মধুসূদনকে পাইয়া তাহাকে আপন জিম্মায় রাখিল। এদিকে গবেশরায় বাবুদের সুরার্চ্চনার বহুতর সাহায্য করিলেন। যে “ভদ্রত্ব” শিক্ষার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, অদ্য তাহার গুণ ধরিল। ইহাতেই মহাজন বাক্যে আছে “যাকে রাখ সেই রাখে”। রাত্রির গাড়ীতে টিকিট পাইতে কোন কষ্ট হইল না; মধুসূদন ও গবেশচন্দ্র সুখসচ্ছন্দে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## নষ্ট-নির্ণয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে আমরা নরেন্দ্রনাথকে পলায়নপরতার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যাবজ্জীবন দৌড়িতে কাহারও সামর্থ্য নাই, সুতরাং নরেন্দ্রনাথেরও নাই। তবে নরেন্দ্রনাথ কোথায় গেলেন?

আর কোথায় যাইবেন? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে দৌড়িতে দৌড়িতে শঙ্কাবিনাশী, চিন্তাপহারী বাষ্পীয় শকটের আশ্রয় গ্রহণাভিলাষী হইয়া সেই রাত্রিতে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ খাঁটি পরোপকার করিবার জন্য নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, এই জন্য রাত্রি শেষে গঙ্গা পার হইতে তাঁহার কোন বিঘ্ন ঘটিল না। যে টাকা দিয়া পরের হিত করিতেন, অন্ততঃ তাহাতে তাঁহার নিজের হিত হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি?

ভোরের গাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ রীতিমত চড়িলেন। গাড়ীর বেগে নরেন্দ্রের ভয় ও ভাবনা, তারের আশ্রয়ীভূত প্রোথিত শালকাষ্ঠ শ্রেণী, নরেন্দ্রনাথের শঙ্কা-উৎপাদি দেশের ঘর, দ্বার, গাছ, পালা, সকলই পশ্চাৎ দৌড়িতে

লাগিল; শেষে নরেন্দ্রনাথ তাহাদের ভয়ে পলাইবেন কি, বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারাই নরেন্দ্রের ভয়ে পলাইয়া যাইতেছে; যেন গাড়ী এবং গাড়ীর অভ্যন্তরস্থ নরেন্দ্রই হিমালয়ের ন্যায় অচল, অটল ভাবে যেখানকার সেইখানে রহিয়াছেন। গাড়ী ক্রমে বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিল। হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সমস্ত পথ নরেন্দ্রনাথ অবিচলিত ভাবে এক খানি গাড়ীর এক খানি বেঞ্চ যুড়িয়াছিলেন; এক বার মগরা ষ্টেশনে এক জন অসাবধান, অতিব্যস্ত যাত্রী তাঁহার উপর বসিবার উপক্রম করাতে ঈষৎ বিকট অথচ মধুর শব্দ করিয়াছিলেন মাত্র।

বাঙ্গালা নাগরের সূতিকাগৃহ বা ধাত্রীক্রোড় স্বরূপ বর্দ্ধমানে নরেন্দ্রনাথ যান হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বঙ্গীয় কবিগুরুর কল্পনা-রোপিত বকুল বৃক্ষ যদি এ পর্য্যন্ত থাকিত, তাহা হইলে নরেন্দ্রনাথ তাহার তলা ভিন্ন অন্য স্থানে গিয়া বসিতেন না। এক্ষণ তাহা ছিল না বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান ষ্টেশনের বাহিরে এক বটবৃক্ষমূলে আত্মাকে স্থাপিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগে শীতল করিলেন। কেহ কেহ ভাবনাগ্রস্ত হইতে পারেন, এই হেতু আমরা স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছি যে, যাবৎ নরেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া রহিলেন, তাবৎ জল আনিতে কক্ষে গাগরী লইয়া কোন নাগরী, বা ফুল তুলিতে কোন মালিনী তথায় উপস্থিত হইল না। সুন্দরের কৃতিকীর্ত্তি যদি সে সময়ে নরেন্দ্রের মনে পড়িয়া

থাকে, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন যে "ম্লেচ্ছরাজ্যে আমাদের অনেক প্রকার সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে।"

কবিকেশরী রায়গুণাকর প্রথমতঃ সুন্দরকে "বর্দ্ধমান পুরী" তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া পরে অন্য অন্য কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন সে গড় নাই, সে থানা নাই, সে বর্দ্ধমানই নাই; সুতরাং নরেন্দ্রনাথকে সে প্রকারে নগর দেখাইবার প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন থাকিলেও বড় সুখ নাই। বর্দ্ধমানের রাজমার্গ সমুদয় রক্তরজোময়, পঞ্চাশ হাত চলিতে হইলেই জানু পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠে। এই সকল হেতু বশতঃ নরেন্দ্রনাথ বড় একটা কোথায়ও গেলেন না। এক জোড়া জুতা কিনিবার প্রয়োজন হওয়াতে নরেন্দ্রনাথ একবার বাজারে গিয়াছিলেন; কিন্তু নিতান্ত "পেটের দায়" না হইলে ভদ্রলোকে জুতার দোকানে যায় না, আমরা ত কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত নহি, অতএব নরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে বাজারে যাইবার আবশ্যকতা নাই। পাছে কেহ ধরিয়া রাখে, বোধ হয় এই জাতীয় কোন আশঙ্কা প্রযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মহারাজার চিড়িয়াখানা দেখিতে যান নাই।

এক জন ভদ্রলোকের বাসায় নরেন্দ্রনাথ অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেখানে দুই দিবস থাকিলেন, কিন্তু পরে কি কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন

না। পতঙ্গ আপনা আপনি অগ্নি শিখায় গিয়া পড়ে; নরেন্দ্রনাথ পতঙ্গ নহেন, এজন্য কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত বোধ হইল না। পরীক্ষার পর বাটী যাইবার কথা, সুতরাং এ সময়ে বাটী গেলে, অনেক জবাবদিহিতে পড়িতে হয়; তাহাও ত হইল না। বর্দ্ধমানে থাকিতে হইলে, তাহার একটা উপায় বিধান করিতে হয়। এই রূপে প্রদীপের শিখার ন্যায় নরেন্দ্রনাথের চিত্ত এদিক ওদিক করিতেছে, এমন সময়ে ঝড় আসিয়া সে প্রদীপ নিবিয়া গেল; এক খানি সংবাদপত্র আসিয়া তাঁহার সকল বুদ্ধি লোপ করিল। নরেন্দ্রনাথ পড়িলেন——

"পুলিশের অসামান্য কৌশলে গোলদিঘীর ধারের এক গলিতে সন্দেহসূচক অবস্থায়, সন্দেহজনক এক খণ্ড জুতা বাহির হইয়াছে। কত দিন অবধি চর্ম্মপাদুকা সে অবস্থায় ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। পাদুকার অধিকারী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পাদুকা পুনঃগ্রহণ করিবেন না, অবস্থা দৃষ্টে এবং কঠোর অনুসান্ধের দ্বারা পুলিশ ইহা অবধারণ করিয়া সংবাদ দিয়াছেন, 'যদি কেহ ফেরারী জুতার মালিককে ধরিয়া দিতে পারেন, অথবা যাহাতে ধরা যায়, এমত সুযোগ করিয়া দিতে পারেন, অথবা যাইতে পারে, এমত সম্ভাবনা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে ৫০ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

সংবাদপত্র নরেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া বাপান্তবাগীশ তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল; মাথা ঘুরিতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; বাম হস্তে মুখ চাপিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, চক্ষুর শ্বেতভাগ সমস্ত বাহির করিয়া নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি নরেন্দ্র অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিলেন না। তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই মন এক প্রকার স্থির করিলেন। সংসার অসার, ধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিলেই তাহাতে বহু বিঘ্ন নিশ্চিত, সাধুপথে অনেক কণ্টক, এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, বিকালে, কাহাকেও না বলিয়া নরেন্দ্রনাথ সে বাসায় অদৃশ্য হইলেন। অগম্যদেশে গিয়া কাল যাপনার সংকল্প করিয়া দ্বিতীয় বার রেলওয়ের আশ্রয় গ্রহণের অভিলাষী হইলেন; এবং তদনুসারে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রাত্রিতে গাড়ী পাইলেন না। পর দিবস সকালে রাণীগঞ্জের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ষ্টেশনের একটী রসিক বাবু নরেন্দ্রকে দেখিয়া বলেন যে ওজন করিয়া তাঁহাকে মাল গাড়ীতে বোঝাই করা উচিত।

হু হু শব্দে বাষ্পীয় রথ নরেন্দ্রনাথকে ঘৃণিত দেশ হইতে লইয়া চলিল। তাঁহার মন বাপান্তবাগীশময়, এ জন্য তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে (ধান্যাদি বর্জ্জিত) মাঠ

সকল তাঁহারই দুঃখে দুখী এবং বাপান্তবাগীশের ভয়ে ভীত হইয়া সে রূপ শুষ্ক ভাব, ম্লান ভাব অবলম্বন করিয়াছে। অবশেষে বাপান্তবাগীশের ভয়ে বিব্রত হইয়া রথ আর পথ ঠিক করিতে পারিল না; রাণীগঞ্জে হত বুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। অগত্যা বেলা দুই প্রহরের সময় নরেন্দ্রনাথ নিজের পথ দেখিতে গাড়ী হইতে নামিলেন। ষ্টেশনের পূর্ব্ব দিকে তিন চারি রশি অন্তরে একটী মুদীর দোকান আছে জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথ সেই দিকে দেহ-রথ চালাইলেন। মুদীর দোকানে পৌঁছিলেন।

ডালার উপর একটী ছিদ্র কাটা, লোহার কবজায় দেহ প্রায় আবৃত একটা কাঠের বাক্স সম্মুখে করিয়া, সেই বাক্সের উপর, এক খানি কৃত্তিবাসের রামায়ণে বটতলার কারিকরগণ যে সকল মুদ্রা-দোষ সংগ্রহ করিয়াছিল, মুদী স্বরসংযোগ করিয়া সেই গুলিকে জাজ্বল্যমান করিতেছিল। সুতরাং তাহার পাঠ প্রণালীতে নরেন্দ্রনাথ যে একটী শব্দও আগাগোড়া বুঝিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না, তাহাতে কতক গৌরব মুদীর, কতক তাহার সুরের এবং অবশিষ্ট "ছাপাওয়ালার ভূতের"। নরেন্দ্রকে দেখিয়া পুঁথির মধ্যে এক গাছি তৃণ দ্বারা স্থানের নির্দ্দেশ রাখিয়া, মুদী মহাশয় স্বপ্রণীত বাঁশের মাচা হইতে ভূমিষ্ঠ হইল। নরেন্দ্রকে বসিতে দিয়া (ব্রাহ্মণ জানিয়া) করযোড়ে একটা প্রণাম, ও তামাক সাজিয়া দিল। কোথা হইতে আগমন, কোথায় বা গমন,

ইত্যাদি প্রশ্নের অসন্তোষকর উত্তরে মুদী সন্তুষ্ট হইয়া নরেন্দ্রনাথের পাকের ব্যবস্থা করিতে লাগিল ; নরেন্দ্রনাথ সেই সময়ে স্নান করিয়া আসিলেন। "ঘাটে আহ্নিক সারিয়া আসিয়াছেন" মুদীর প্রশ্নে নরেন্দ্রনাথ গলা ঝাড়িয়া ইহা জানাইলেন ; এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নাদি লইয়া জঠরাগ্নির দমন করিলেন, ও পাক করিবার অগ্নি জ্বালিয়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া, গলায় কড়ি ঝুলান হুঁকা হস্তে দোকানের বাহিরে এক খানি টুলের উপর বসিলেন।

নরেন্দ্রনাথ বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন এবং এক এক বার জ্বাল ঠেলিয়া আসিতেছেন ; এমন সময়ে চারিটা বাহকের স্কন্ধে, এবং অতিরিক্ত আট জন সঙ্গে, এক খানি পাল্কী আসিয়া দোকানের সম্মুখে থামিল। পাল্কীতে এক পাল্কী মানুষ বোঝাই, কিন্তু মানুষ এক জন মাত্র। যিনি পাল্কীর অভ্যন্তর দেশ ব্যাপিয়া ছিলেন, তিনি অতিকষ্টে পাল্কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া পাল্কীতে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। এ ব্যক্তি স্থূল কি সূক্ষ্ম আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না ; তবে এক বার ইনি হস্তী-পৃষ্ঠে যাইতেছিলেন, এক জন দুঃখিনী স্ত্রীলোক তাহার কোলের ছেলেকে সেই সময়ে হাতী দেখিতে বলায়, গোপাল (সেই ছেলের নাম) জিজ্ঞাসা করে "মা! কোন্‌টা? যে টা নামোয়, না যেটা ওপরে?"। পরে জানা গেল ইহাঁর নাম কালীনাথ ধর। ধর মহাশয়ের চারি খানি গাল, ও

একাদিক্রমে তিনটী পেট। মস্তকের উপরিভাগ অপেক্ষা চিবুকাদি সহিত নিম্নভাগ প্রায় দ্বিগুণ প্রশস্ত। হস্ত পদাদি শরীরের অনুরূপ; হস্তাঙ্গুলি যেন এক একটী পেয়ারা। ধরজীর বর্ণ কেমন নিশ্চয় করা দুরূহ; কলিকাতার রাস্তায় নূতন পাথর ফেলিলে যেমন কর্কশ দেখায়, দক্র দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া প্রযুক্ত ইহাঁর কলেবর সেইরূপ শোভা পাইতেছিল। ইহাঁর বয়স ৫৬। ৫৭ বৎসর।

মুদী নমস্কার করিয়া ধরজীর নিকট দণ্ডায়মান হইল, এবং সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার সঙ্গে অনেক প্রকার আলাপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুদী নরেন্দ্রনাথকে বলিয়া দিল "ধর মহাশয় দেশ মান্য ব্যক্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য, জমীদারি আদিতে বহুতর আয়, দোল দুর্গোৎসব সমস্ত দেব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা আছে, ইত্যাদি"। এই সময়ে ধরজী মুখবিকৃতি সহকারে মনকে দক্র কণ্ডুয়নে নিযুক্ত করিলেন, সুতরাং মুদীর কথা শুনিলেন কি না, বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু মুদীর কথা শেষ হইবা মাত্র নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ষাঁড় লাঞ্ছিত স্বরে, অর্দ্ধচন্দ্র নিন্দিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মণ?" এবং নিশ্চয়াত্মক "আজ্ঞা" পাইয়া যুগ্ম হস্তে শিরস্পর্শ করিলেন। হাত যোড় করা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথেরও এক ছড়া কলা মনে পড়িল।

কালীনাথ ধর মহাশয়ের মুদী যেরূপ পরিচয় দিল, তাহা প্রায়ই সত্য। ধরজী পূর্ব্বে ফৌজদারি আদালতের

শেরেস্তাদার ছিলেন; কুড়ি টাকা বেতন পাইতেন, কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপায় অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অবশেষে কালাকাল না মানিয়া স্থানাস্থান কণ্ডুয়নের দোষে বা গুণে, সাহেব তাঁহাকে অলসবৃত্তি (পেন্সন) দিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করেন। ধরজী কর্ম্ম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠা খাওয়া ছাড়িয়া এক জন গোঁড়া বৈষ্ণব হন। সুতরাং তন্ত্রাদি উক্ত শাক্ত পূজা সমুদয় ভিন্ন সকল পর্ব্বেই ইহাঁর বাটীতে উৎসব হইত। রাণীগঞ্জের ৪ ক্রোশ পূর্ব্ব রাজহাট গ্রামে ইহাঁর বাস।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব দেখিয়া ধরজী নিজ সন্তানকে ইংরাজী শিখাইবার মানস করেন; কিন্তু আদরের ছেলেকে বিদেশে রাখা অসম্ভব বিবেচনায় সে মানস এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইচ্ছা যে গ্রামে রাখিয়াই ছেলেটীকে লেখা পড়া শিখান। নরেন্দ্রনাথ ইংরাজী জানেন, শুনিয়া অদ্য নরেন্দ্রের নিকট সেই বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। নরেন্দ্রনাথ অনেক ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু বাপান্তবাগীশের কথা মনে পড়াতে ইহাঁর আর বিচার শক্তি রহিল না। তখন অগত্যা কুড়ি টাকা বেতন এবং ঠাকুর বাড়ীতেসরকারি খরচে ভোজন ও বাসা ভাড়া না লাগিবার বন্দোবস্তে ধরজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ধরজী কথা বার্ত্তা স্থির করিয়া পাল্কী উঠাইতে বলিলেন; ধরজীর ভার হতভাগ্য বাহকদের স্কন্ধে পড়িল।

নরেন্দ্রনাথ আহারাদি সমাপন করিয়া বিকালে রাজ-ঘাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন; সন্ধ্যার পরেই ধরজীর বাটীতে পৌঁছিলেন।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### স্বর্গের সোপান।

বেলা অনুমান ছয় দণ্ডের সময় শ্রীলশ্রীযুক্ত কালীনাথ ধর মহাশয় "দ্বার দিয়া বসিলেন বাহির দেওয়ানে।" বাটীর প্রধান কর্ম্মচারী রামকুমার দত্ত, পাড়ার রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণুলাল অধিকারী ও মনোহর ঘোষাল, পুরোহিত শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য তিন দিক বেষ্টন করিয়া বসিল। বিছানা হইতে কিছু অন্তরে ভূশয্যায়, গ্রামের নফর মণ্ডল, বলহরি কৈবর্ত্ত ও হানিফ সেখ উপবিষ্ট। ধরজী প্রস্তাব করিলেন "ম্যাস্টর আনা গেল, এখন ইহার একটা বন্দো-বস্ত করিতে হয়।" একটা মেষ জলে পড়িলে, পালের সমস্ত গুলাই যেমন তাহার অনুকরণ করে, ধরজীর প্রস্তাবে

সকলেই সেইরূপ সম্মতি প্রকাশ করিল। কেবল হানিফা শ্বাস দমন করিয়া বলিল "কর্ত্তার মর্জ্জী" এবং নফর মণ্ডল কোন কথাই কহিল না। যদিও ইহাদিগকে এই কার্য্যের জন্য ডাকিয়া আনা হয়, কিন্তু এ সময়ে তাহাদের মতামতের অপেক্ষা করা কাহারও বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হইল না। ধরজী নিজ গ্রামে সেপত্তনী লইয়াছিলেন।

বন্দোবস্তের কার্য্য চলিতে লাগিল। গ্রামস্থ সকল ব্যক্তির নামে চাঁদা ধরা হইল। ব্যক্তি বিবেচনায় কাহারও মাসিক আট আনা, কাহারও চারি আনা, কাহারও দুই আনা পর্য্যন্ত ধরা হইল। গ্রামের মধ্যে ভবী বাম্‌ণী ও পদী চাঁড়ালের শরীর অলংঘ্য রহিল, চাঁদার কাগজে তাহাদের নাম উঠিল না। সম্পত্তির মধ্যে ব্রাহ্মণীর এক চরকাকল চলিত; চাঁড়াল কন্যা মাঠের সমস্ত গোবর সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করার ভার লইয়াছিল, এবং ব্যবসায়টীতে তাহারই এক প্রকার একচাটিয়া হইয়াছিল।

বন্দোবস্ত যথারীতি অগ্রসর হইতে লাগিল। ধরজী প্রত্যেক প্রজার জমার উপর টাকা প্রতি এক আনা হিসাবে বিদ্যালয় খরচার ব্যবস্থা দিলেন। নফর মণ্ডলের উপর ফাঁশীর হুকুম জারি হইলেও, তাহার ঠোঁট এত শুকাইত না, চক্ষু এরূপ বসিয়া যাইত না, কপাল এ প্রকার কুঞ্চিত হইত না। নফর এক নিশ্বাসে সাত নিশ্বাসের কাজ করিল। "মামুকে যাইয়া বলি, পান্তীও উঠিল"—এই বলিয়া হানিফা

উঠিয়া গেল; নফরও আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, হানিফার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া চলিল।

রক্তের সংস্রব পাইবামাত্র সর্পবিষ সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া উঠে। ধরজীর বিদ্যালয় খরচার প্রস্তাবে নফর ও হানিফা বাটীর প্রাঙ্গন ছাড়াইতে না ছাড়াইতে রামকুমার দত্ত তাহাদের সঙ্গ ধরিল, এবং মৃদুমন্দ স্বরে বলিল “শালারা আদত গরু কি না! যে ডালে বসিস্ সেই ডাল কাটিস্! যখন পেয়াজ পয়জার দুই হবে, তখন তোরা পথে আস্‌বি! আমায় একটা কথা বল, কর্ত্তাকে নগদ কিছু খানা ক'রে দে, দেখ্, এক কথায় তোদের অর্দ্ধেক কমাইতে পারি কি না?” হানিফা ও নফর দুই জনে অনেক পরামর্শ করিল, অনেক ভাবিল, অনেক বিতণ্ডা করিল, এবং অবশেষে স্থির করিল যে তাহাদের দ্বারা এ কথার কিছুই স্থির হইবে না। তখন রামকুমার দত্তের সহিত একটা বন্দোবস্ত হইল; সেই বন্দোবস্তের বলে, উভয়ে দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে পুনরায় ধরজীর নিকট ফিরিয়া গেল। প্রজাবর্গের মধ্যে নগদ দুই শত টাকা উঠাইয়া দিবে, জমার প্রত্যেক টাকায় দেড় পয়সা হিসাবে বিদ্যালয়ের জন্য দিবে, কিন্তু তাহা খাজানার কবজে জমার মধ্যে লেখা যাইবে না, এইরূপ কথা বার্ত্তা নিশ্চয় করিয়া হানিফা ও নফর মণ্ডল চলিয়া গেল। জমীদার মা বাপ, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ হইল না।

ধর মহাশয় নরেন্দ্রনাথকে ডাকিবার জন্য এক জনের প্রতি আদেশ করিলেন। বাটীর বাহিরের দরজার পার্শ্বের এক কুঠরীতে নরেন্দ্রনাথকে বাসা দেওয়া হইয়াছিল। সে ঘরে অনেক দিন হইতে কেহ বাস করে নাই দেখিয়া এক দল মশা সেই খানে বাসা লইয়াছিল; নরেন্দ্রনাথ রাত্রিতে একটী বিছানা পাইয়াছিলেন, কিন্তু মশারি পান নাই। সুতরাং মশাগণ একে একে এবং ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহার সহিত আলাপাদি করাতে, শিষ্টাচারের অনুরোধে তিনি রাত্রিকালে নিদ্রার অবকাশ পান নাই। প্রভাতে উভয় পক্ষ বিশ্রাম গ্রহণ করেন, এই জন্য নরেন্দ্রকে যখন ডাকিতে গেল তখন তিনি যমের কনিষ্ঠের হেফাজতে ছিলেন। অনেক উপরোধ বিরোধের পর নরেন্দ্র ইহলোকে ফিরিয়া আসিলেন, এবং মুখ ভার করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন। সম্পূর্ণ জ্ঞান যোগ হইলে, মুখে জল দিয়া চক্ষু মুচিতে মুচিতে আসিয়া ধরজীর সভায় কলেবর সমর্পণ করিলেন।

ধর মহাশয় যদিও চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সংসারের নিকটেও অবসর পাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তথাপি রসিকতার হাত এড়াইতে পারেন নাই। নরেন্দ্রনাথ এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলেন, এই জন্য দুই চারিটী কঠোর ব্যঙ্গের ভাগী হইলেন। উপস্থিত-বুদ্ধি নরেন্দ্র মশার উপর দিয়া ধরজীর রসিকতার ধার ফিরাইয়া দিলেন। অন্যান্য পাঁচ কথার পর, ধরজী নরেন্দ্রনাথের

হস্তে চাঁদার কাগজ দিয়া বলিলেন "বিদ্যালয়ের টাকার ত এই উপায় করিয়াছি, এখন আপনি কাজের ভার লইলেই হয়।"

নরেন্দ্র চাঁদার ফর্দ্দে একটীও পরিচিত নাম দেখিলেন না, (সে স্থানে তাঁহার পরিচিত একমাত্র ধরজী)—কিন্তু তাঁহার বেতনের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা ফর্দ্দে দেখিয়া শীঘ্রই বেতন বাড়িতে পারিবে, এই সম্ভাবনায় আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া বিস্মিত হইতে ভুলিয়া গেলেন। তাহার উপর, দেশহিতৈষী ধর মহাশয় যখন বলিলেন যে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা যাইবে, তখন নরেন্দ্রনাথ কেন ফুটীফাটা হইলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য।

আর দুইটী কথার মীমাংসা হইলেই নরেন্দ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। প্রথম কথা এই যে, ধর মহাশয় চাঁদার কাগজ নরেন্দ্রের হস্তে দিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "টাকা আপনাকে আদায় করিয়া লইতে হইবে।" বহু আন্দোলন, অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেস এই হইল যে নরেন্দ্র তাহাতে অক্ষম, এজন্য ধরজী নিজের লোকের দ্বারা টাকা আদায় করিয়া দিবেন, কিন্তু লোকের বেতন ঐ টাকা হইতে কাটা যাইবে। একটা বিষম গুরুতর কথার এরূপ সন্তোষকর নিষ্পত্তি হইবে, এ প্রত্যাশা কাহারও ছিল না; এজন্য উভয় পক্ষ ইহাতে ভয়ঙ্কর তৃপ্তিলাভ করিলেন।

দ্বিতীয় কথা এই;—বহুকাল হইতে গ্রামের একজন গুরু-

মহাশয় রাজহাটের ছেলেদের শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজী বিদ্যালয় হইলে পাঠশালা থাকা অসম্ভব; এমন কি থাকিলে চলিতেই পারে না; সুতরাং গুরুমহাশয়কে বালকদের হাতছাড়া করা আবশ্যক। যখন এ প্রস্তাব হইল, তখন কয়েক জন নিষ্কর্ম্মা সভাসদ ঘোরতর আপত্তি উপস্থিত করিল। কিন্তু যেমন আগুন লাগিলে খড়ের চাল নিশ্চিত পুড়িয়া ছাই হয়, সেইরূপ ধর মহাশয়ের বাক্যে, ইহাদের আপত্তি নির্ব্বিবাদে খণ্ডিত হইয়া গেল। পরন্তু প্রথম কথা সম্বন্ধে নরেন্দ্র যে প্রকার কৌশল করিয়া, টাকা আদায়ের ভার ধরজীর উপর ফেলিয়া দেন; গুরু তাড়ান বিষয়ে সেরূপ ঘটিয়া উঠিল না। গুরু মহাশয় অগত্যা তাঁহারই ঘাড়ে পড়িলেন।

যখন কথার শেষ হইয়া গেল, তখন শুভকার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নয়, বিবেচনা করিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই নরেন্দ্র এক জন লোক সঙ্গে পাঠশালায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

গুরু মহাশয় তিনকড়ি সরকার দক্ষিণ হস্তে কঞ্চির ছড়ি, বাম হস্তে তামাক সাজা হুঁকা লইয়া মোড়ার উপর বসিয়া আছেন। গুরু মহাশয় খর্ব্বাকৃতি, কৃশ, বাল্যকালে বসন্ত হইয়াছিল বলিয়া মুখে যেন ডায়মণ্ড কাটা, কৃষ্ণবর্ণ, বয়স ৩৭। ৩৮ বৎসরের অধিক নয়। চতুর্দ্দিকে ছেলেরা যার যেখানে ইচ্ছা বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছে; কোথায়ও এক জন সর্দ্দার ছেলে দুই তিন জন শিশুকে মাটীর উপর

খড়িতে লিখিয়া এবং লেখাইয়া অঙ্ক এবং ধূলা মাখা শিখাইতেছে; আর এক স্থানে একটী শিশু কলুর বলদের মত দাগা অক্ষরের উপর নিয়ত খড়ি চালাইতেছে; অন্যত্রে অনেক গুলি বালক তালপাতায় "মৃত্যুঞ্জয়" "উপেন্দ্রকৃষ্ণ" প্রভৃতি কঠিন কঠিন নাম লেখা শিখিতেছে; কেবল একজন "হলধর ঘটক" লিখিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় এক দণ্ডে একটী পাতাও শেষ করিতে পারিতেছে না। বাহিরে ঢোলের বাদ্য শুনিয়া একত্রে পাঁচটী ছেলে "গুরু মশায়, পেচ্ছাপ ক'রে আসি" বলিয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে; তিন চারি জন অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালক মুখ ভঙ্গীর সহিত কাগজ লিখিতেছে। গুরু মহাশয় নরেন্দ্রকে দেখিয়া মোড়া ছাড়িলেন না, কিন্তু অভ্যর্থনা করিয়া একটী বালকের প্রতি তামাক সাজিবার আদেশ করিলেন। নরেন্দ্রের পেটের খবর গুরু মহাশয় যদি জানিতেন, তাহা হইলে, তামাকের পরিবর্ত্তে ছড়ি দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা হইত, আমাদের এই বিশ্বাস। নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন, গুরু মহাশয় তাঁহার নাম, ধাম, জাতি, কর্ম্ম, বেতন, এই সকল কথার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

চক্রী নরেন্দ্রনাথ স্থান কালাদি অল্প অল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তৎপরেই সুযোগ বুঝিয়া তিনকড়ি সরকারের অন্ন মারার প্রসঙ্গ অতিশয়

মাধুর্য্যের সহিত আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন—"বালক এবং বালিকা শিক্ষা বড় সহজ ব্যাপার নয়; এবং বিশেষতঃ শিক্ষার উপর ধর্ম্মের নির্ভর, যেমন কলসীর উপর জল। সুতরাং কলসীতে ছিদ্র থাকিলে জল পড়ে; অতএব শিক্ষা প্রবল চাই। এবং বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ধর্ম্মের হীনাবস্থা; যুধিষ্ঠিরাদি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ বিধবা বিবাহ"——(নরেন্দ্র এ কথা জন্মে ভুলিবেন না)——"ব্যবস্থা দিয়া করিয়া গিয়াছেন। অতএব এ সমস্ত গুরুতর বিষয় অসভ্য গুরু মহাশয়ের হস্তে রাখা যাইতে পারে না। পরন্তু ইংরাজের রাজ্যে এই সমস্ত চলিবার যোগ্য হইতে পারে না। অতএব আমি ইংরাজী বিষয়ে যথার্থ বিদ্যা এবং জ্ঞান এবং সভ্যতা এবং নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত ধর মহাশয়কে ভূয়োভূয় ধন্যবাদ দিতে হয়।"

গুরু মহাশয় কিতাবতী লেখা পড়া জানিতেন মাত্র; এবং অল্প ব্যয়ে, ক্ষুদ্র লোককে অল্প বিদ্যা দান করিয়া পাটওয়ারি, নায়েব ইত্যাদির সৃষ্টি করিতেন; নরেন্দ্রনাথের ন্যায়ের গাঁথনির ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎকাল অবাক হইয়া থাকিয়া পরে বলিলেন "আপনি কি ম্যাষ্টার হয়ে এসেছেন? তা বেস্ ত আমায় এখন কি করিতে হইবে?"

নরেন্দ্রনাথ ইহার অন্য সদুত্তর স্থির করিতে না পারিয়া

বলিলেন "ধর মহাশয়ের নিকটে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।"

* * * * * * *

যথাকালে পাঠশালাটী ভাঙ্গিয়া গেল ; নরেন্দ্রনাথ কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলেন; বালকেরা নামতা, কড়ানে, মটকে, ইত্যাদি ভুলিতে লাগিল ; হাতের লেখা অপাঠ্য হইতে লাগিল; রাজহাট হইতে "পরম পূজনীয়" শিরোনামা এবং "সেবক শ্রী——" পাঠ উঠিয়া গেল; ভবিষ্যতে দুই চারি জন শুঁড়ির প্রতিপালন হইবে, তাহার বুনিয়াদ হইল। তিনকড়ি সরকার মুদীখানা করিয়া সচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল; আমার লেখনী কিয়ৎকালের জন্য বিরাম হইল।

# নবম পরিচ্ছেদ।

"যার কেউ নাই, তার হরি আছে।"

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বিদ্যার ন্যায় ধন নাই; অন্য বস্তু আগুনে পোড়ে, জলে ডোবে,—চোরে লয়, এবং বিনা বিয়ে ব্যবহার করিলেও ক্ষয় পায়। কিন্তু বিদ্যার সে সমস্ত বিড়ম্বনা নাই; বরং ব্যবহারে পরিমার্জ্জিত এবং দানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। আমরাও ভ্রমর রূপে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া বিবিধ বিদ্যালয় রূপ পুষ্পবৃক্ষে রং বরং অধ্যাপক রূপ পুষ্প হইতে টিকা, টিপ্পনী, সংক্ষিপ্তসার, ধাতু ও "সমান্তরাল বাক্য*" প্রভৃতি-রূপ মধু মুখস্থ করিয়া খাতা-রূপ মৌ-চাকে সঞ্চয় করিয়াছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ পরীক্ষক রূপ দুষ্ট বালকগণ অধিকাংশ মধু গালিয়া লইয়াছিলেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, পত্র লেখা রূপ জঠর জ্বালা নিবারণ করিতে তাহাও গিয়াছে; এমন কি, গ্রন্থকার একখানি পত্র লেখাতে তাঁহার এক জন স্পষ্টবাদী বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যে উক্ত পত্রে যে মধু খরচ হইয়াছে, গ্রন্থকার মহোদয় ছয় মাসেও তাহার পূরণ

---

* Parallel Passages.

করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কোন্ মধু ছড়াইবার আশায় গ্রন্থকার এই পুস্তক লিখিতে সাহস সহকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা তোমার আমার মত লোকের কর্ম্ম নয়। যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ে সঞ্চিত বিদ্যাধনের ক্ষয় আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পণ্ডিতগণের বাক্য আমাদের পক্ষে খাটে না। কিন্তু বঙ্গদেশ যেমন সমগ্র পৃথিবী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ও সেই রূপ বিদ্যার ব্রহ্মাণ্ড নয়। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে সম্ভবতঃ আমাদেরই বেলা ব্যভিচার, তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র পণ্ডিত-গণের উক্ত কথাই নিয়ম। আমাদের এ বিশ্বাস জন্মি-বার কারণ এই যে, আমাদেরই দলের দুই এক জন আমা-দের অবস্থার ব্যতিক্রম দেখাইয়া থাকেন। নরেন্দ্রনাথ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

কঠোর করিয়া অকাতরে নরেন্দ্রনাথ রাজহাটের বালক-দিগকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। দুই মাস চাকরী করা হইল, নরেন্দ্রনাথ এক পয়সাও বেতন পাইলেন না; ঠাকুরবাড়ীতে দুই বেলা যাহা পাইতেন, তাহাতে "গ্রাসের" জন্য চিন্তা ছিল না; কলিকাতা হইতে যাহা সঙ্গে আনি-য়াছিলেন, তাহাতেই এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে "আচ্ছাদনের" কষ্ট পাইতে হয় নাই। তথাপি কর্মত্যাগের দুরভিসন্ধি একবারও তাঁহার পবিত্র মনকে কলুষিত করে নাই। এই জন্যই আমরা বলিলাম যে "কঠোর করিয়া" এবং "অকা-

তরে” এবং “বিদ্যাদান” নরেন্দ্রনাথ এ তিনই করিতেছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, নরেন্দ্রের শরীর বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কিছুই ক্ষীণ হইল না। সত্য বটে, নরেন্দ্রনাথ রাজহাটে সকলের নিকট স্পষ্টাক্ষরে ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া পরিচয় দিতেন, ‘ব্রাহ্মের’ নামোল্লেখও করিতেন না; কিন্তু ধর্ম্মের যে সমস্ত মূলতত্ত্ব, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যে দেশের উন্নতি, যাহার পথ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি, তাহা নরেন্দ্রনাথ ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হন নাই। যদি কেহ তাঁহাকে বাপান্তবাগীশের মৃত্যু সংবাদ বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হওয়ার সমাচার আনিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই নরেন্দ্রনাথ কলিকাতা গিয়া ধর্ম্মসাগরে আত্মাকে জন্মের মত ডুবাইতেন। আর নরেন্দ্রনাথের বিদ্যা?—তাহা ত পুরুভুজের মত বাড়িতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের ইংরাজী শিক্ষকের মত হতভাগ্য জীব আর দ্বিতীয় নাই; গ্রামের লোকের সংস্কার থাকে ‘ম্যাষ্টর’-কুল চৌদ্দ ভুবনের খবর দিতে বাধ্য। কেহ গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিল; প্রাণ-ভয়ে ম্যাষ্টরের একটা না একটা উত্তর দিতেই হইবে। কেহ অশৌচ ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করে। কেহবা শরা অনুসারে আবদুল খালেকের ফুফার জায়দাদ, ফৌৎ হইলে কে পাইবে, জিজ্ঞাসা করিল। গ্রামের লোকের নামে ডাকে যে সমস্ত পত্র আইসে তাহার প্রায় সমস্তই শিক্ষক বাবুকে পড়িয়া দিতে হয়। ফলতঃ

লাঙ্গল এবং ঘানি ভিন্ন পাড়াগায়ের শিক্ষক সকল কার্য্যেই লাগেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা এই উপলক্ষে বিদ্যা বাড়াইয়া লন; যাঁহারা বোকা, তাঁহারা জীবন এবং শিক্ষকতা একার্থ-বোধক করিয়া লন। নরেন্দ্রনাথ আপাততঃ উভয় দলেই থাকিলেন।

রাজহাট বিদ্যালয়ের বালকগণকে নিয়ত "গরু" এবং "গাধা" বলিতে বলিতে শিক্ষক জাতির অনিবার্য্য নিয়মানুসারে নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে প্রকৃতই "গরু" এবং "গাধা" বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু জড়ভরতের কথা তাঁহাদের উপরেও যে খাটে, এটা তাঁহার বোধগম্য হইল না। পক্ষান্তরে ধরজীর ডাকের চিঠির ঠিকানা লিখিতে লিখিতে নরেন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ কেরাণীগিরির বীজ রোপণ করিতেছিলেন; ধরজীর জ্ঞাতি কুটম্বের ছেলের কাঁথা শেলাই এবং পরিবারস্থ সকলের রিফুর কর্ম্ম করিয়া নরেন্দ্রনাথ সূচীকার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন; এবং সর্ব্বোপরি গ্রামস্থ দুই চারি জনের নাড়ী টিপিয়া তিনিও এক জন ওলাউঠা, সর্প দংশন প্রভৃতির মধ্যে হইয়া উঠিলেন। যখন নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে গ্রামের চাঁদার টাকা ইত্যাদি সমস্ত (অবশ্য তাঁহারই ভবিষ্যৎ উপকারের জন্য) ধরজীর হস্তে বা শরীরের অন্য কোন দেশে মজুত হইতে লাগিল, তখন, ছাত্রদত্ত বেতনের টাকায় রাণীগঞ্জ হইতে ঔষধাদি আনাইয়া দেশে কস্মিন্ কালেও দুর্ভিক্ষ না

হইতে পারে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে আরও একটী ফল হইল। নরেন্দ্রনাথ ঔষধের বলে অনেক পরিবারের মধ্যে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস অজ্ঞাত, এক জন বিশিষ্ট কুলীনের সন্তান। ইহাঁর প্রথম বিবাহের পর শিবত্ব প্রাপ্তি হয়; অর্থাৎ ইনি আবকারীর মুরুব্বী হইয়া উঠেন। অর্থের কিছু অনটন প্রযুক্ত বিষ্ণুরাম একদা "পর দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" জ্ঞান করেন, এবং সেই উপলক্ষে ইহাঁর আত্ম পরে তুল্যবোধ দেখিয়া কোম্পানী বাহাদুর ইহাঁকে যত্নের সহিত নিজ ভবনে রাখিয়া ছয় মাস কাল পরিচর্য্যা করেন। যে কারণেই হউক, ছয় মাস গত হইলে এক মাত্র কোম্পানীকে আর কষ্ট দেওয়া অন্যায় বিবেচনা করিয়া, বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায় বহু প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া বিক্রমপুরের ভাগ্যধর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনেক টাকা লইয়া সেই খানে নিজের কুল ভাঙ্গিলেন। টাকা চিরদিন থাকে না, কিন্তু টাকার গরজ চিরদিনেও যায় না, সুতরাং বিষ্ণুরাম বেগের সহিত বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্ব সমেত পঁয়ত্রিশটী বিবাহ হইয়া গেলে, তিনি রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অপরিচিত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পঁচিশ বৎসরের এক বালিকাকে কুমারী দেখিয়া, বিষ্ণুরাম সদয় চিত্তে "বোঝার উপর শাকের আটী" করিলেন, এবং ত্রিরাত্র এখানে বাস করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। বিবাহের

অষ্টম মাসে বিষ্ণুরামের নবপরিণীতার গর্ব্ভে এক নবকুমারী জন্মিল। নবকুমারী ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, এবং রাম-কিশোর চট্টোপাধ্যায় যথাকালে আসিয়া নবকুমারীকে আট চল্লিশ নম্বরে বিবাহ করিল। নবকুমারীর নাম বিমলা; বয়স এক্ষণ তেইশ বৎসর। ইহার মধ্যে রামকিশোর চট্টোপাধ্যায় দুই বার রাজহাট আসিয়াছিলেন। রামকিশোরের শেষ বার আগমনের পর দেড় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছিল।

সাত বৎসর বয়স্ক অতুলচন্দ্র নামে বিমলার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। আমাদের দেশের প্রথা এই যে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকে, এবং অপরিচিত—(এমন কি, কখন কখন পরিচিত) পুরুষের সম্মুখে তাহারা কখনই আইসে না। পাঠক সম্প্রদায় যে নিতান্ত অপরিচিত, এ কথা ভুলিয়া গিয়া বা মনে না করিয়া অনেক প্রশস্ত-চিত্ত গ্রন্থকার দেশের রীতির বিপর্য্যয় করিয়া তুলেন। আপনি ঘরের খবর জানেন বলিয়া বিশ্বাসহন্তা গ্রন্থ-লেখক নায়িকা, উপনায়িকা, অনায়িকা, আবশ্যক অনাবশ্যক সমস্ত স্ত্রীলোককে সশরীরে পাঠকগণের সমক্ষে টানিয়া আনেন। আমরা ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি, যখন তখন ব্যবহারের বিরোধ করিতে পারিব না। বিমলা দেখিতে শুনিতে কেমন, ইহা জানাইবার প্রয়োজন সত্ত্বেও আমরা তাহাকে বাহির করিতে পারিব না। অতুলের চেহারা দেখিয়া লক্ষণা

দ্বারা যদি কেহ বুঝিতে পারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই, দোষও নাই ; আর যিনি বুঝিবেন তাঁহাকেও দোষ দিব না। (আর একটু ধৈর্য্য ভিক্ষা।) ভাই যদি কুৎসিত হয়, তাহা হইলে সে ভ্রাতার চেহারা দৃষ্টে ভগিনীর রূপের অনুমান বিষয়ে দুই এক জন কখন কখন ঘোরতর আপত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অকপট চিত্তে বলিতে পারি, যে সেরূপ স্থলে আপত্তিকারীর পক্ষপাত জন্মিবার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবেই থাকিবে। সাক্ষী,—আমাদের প্রতিবেশী—বাবু।

অতুলের মা অতুলকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু সাত বছরের ছেলে শ্রীমান্ অতুল বাপাজীবন কাপড় পড়িতে ভাল বাসিত না ; এজন্য প্রায়ই তাহার বিদ্যালয়ে যাওয়া ঘটিত না ; ঘুন্‌শী কোমরে অতুলচন্দ্র বাটীর সম্মুখস্থ পেয়ারা গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। অতুল যখন গাছে থাকিত, তখন তাহাকে স্থানভ্রষ্ট বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইত না। অতুলের চুল এবং ভ্রূ কটা, মুখের ছাঁচ বাঁদুরে।—নাক কিছু চাপা, কান দুখানি পাতলা এবং বড়, রং লোমাবৃত হনুমানের ন্যায়। * মহাদেবের বংশে মস্তকের কিছু বাড়া বাড়ি ; স্বয়ং শিবের পাঁচ মস্তক, কার্ত্তিকের ছয়টী, গণেশের ত হাতীর মাথা। চারিদিক বিবেচনা করিয়া আমাদের ভরসা জন্মিয়াছে যে অতুলের মস্তকটী দুটী মাথার সমান হইলেও কেহ তাহাকে

অযত্ন করিবেন না। অতুলের হাত দুখানি মহাভারতে বর্ণিত রাজাদের হাতের মত, সরু এবং লম্বা।

নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানী, শাস্ত্রের নজীর মানিতেন না। এই জন্য অতুল দশে পাঁচে বিদ্যালয়ে গেলে নরেন্দ্রনাথ ছড়ি দিয়া অতুলের পিঠের রং পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন। প্রিয়-তম নরেন্দ্র, আমাদের কথা শুন, অতুলের সঙ্গে আর এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না। আর, যদি আমাদের কথা এখন না মান, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত যেন অতুলের সঙ্গে এমনি ব্যবহার থাকে।

রবিবারের সূর্য্য রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিল; কেন, তাহা বলিতে পারি না। সমস্ত দিনমানের মধ্যে রাত্রি আসিল না দেখিয়া, সূর্য্য কিছু ব্যস্ত হইল, কিছু রাগান্বিত হইল; রজনী লুকাইয়া আছে বিবেচনা করিয়া, তাহাকে ধরিবার আশয়ে (—এটা আমা-দের অনুমান মাত্র—)সূর্য্য অন্ধকার-গৃহে প্রবেশ করিল। অমনি চাতুরি-রহস্যপ্রিয়া সদ্যঃপ্রবিষ্টযৌবনা কামিনীর ন্যায় সন্ধ্যা আকাশময় দীপ জ্বালিয়া দিল, এবং সূর্য্যকে সমস্ত রাত্রি রজনীর অন্বেষণে ঘুরাইয়া অপ্রতিভ করিবার মানসে, রজনীকে জগতে আনিয়া রাখিয়া আপনি কোথায় চলিয়া গেল।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ নয়ন মুদিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন। মুখে আহার লইয়া ঢোঁড়া

সাপ যেমন এক একবার গোঁ গোঁ শব্দ করে, নরেন্দ্রনাথ সেইরূপ মাঝে মাঝে অস্ফুটধ্বনি করিতেছিলেন। তাঁহার এক জন সুহৃদ একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, যে নরেন্দ্র উপাসনা কালে এই রূপ শব্দ করিতেন, কিন্তু সুহৃদের কথায় বিশ্বাস করা না করা পাঠকবর্গের ইচ্ছাধীন। যাহা হউক, কিঞ্চিৎ কাল পরেই নরেন্দ্রনাথ চক্ষু মেলিলেন; দেখিলেন তাঁহার প্রিয় ছাত্র অতুলচন্দ্র উলঙ্গবেশে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। অদ্ভুত সমবেদনার বলে অতুলের মুখশ্রী নরেন্দ্রের মুখে প্রতিবিম্বিত হইল। নরেন্দ্র একখানি পুস্তক, একগাছা ছড়ি, একটা কোন-কিছু হাত বাড়াইয়া খুঁজিতে লাগিলেন, অথচ সম্মুখের শুটিকত দাঁত অল্প বাহির করিয়া, অতুলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তখন ঘাড় বাঁকাইয়া, ডান হাতে ডান কানের পশ্চাদ্ভাগ চুলকাইতে চুলকাইতে, একটু কোঁস্ কোঁস্ সুরে অতুল বলিল "মা ব'ল্লে, মাস্টর মহাশয়কে ডেকে নে আয়, দিদীর ব্যামো হয়েছে, তাই আমি—"। কথা শেষ না হইতে অতুল প্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নরেন্দ্রনাথ অমনি গলিয়া গেলেন; বলিলেন "তুই আবার কাঁদিস্ কেন? যা তোর মাকে বল্‌গে আমি যাচ্ছি।" মুখ ফিরাইতে ফিরাইতে, আড় চোখে চাহিতে চাহিতে অতুল ত চলিয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্র, "দিদীর ব্যামো" শুনিয়া তুমি ননীর পুতুলের মত হইলে কেন?

অতুল চলিয়া গেল; নরেন্দ্রনাথ যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। আর এক রবিবারের রাত্রিতে—পাঠকবর্গের মনে থাকিতে পারে?—নরেন্দ্রনাথ যেরূপ বেশভূষা করিয়াছিলেন, আজিও সেই অঙ্গের একটু সাজ করিলেন, গর্ণেটের চায়নাকোট অবশ্যই গায়ে দিলেন। বাস্তবিক সে দিন যেমন, আজিও সেই রূপ শুভ উদ্দেশে নরেন্দ্রের যাত্রা; প্রভেদের মধ্যে সে দিন মন্ত্র এবং বাহুবল আবশ্যক, অদ্য বড়ী আর গুঁড়ি আবশ্যক।

নরেন্দ্রনাথ অতুলদের বাটীর বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া 'অতুল, অতুল' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; অতুল তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া বাড়ী ফিরিয়া আইসে নাই, সুতরাং কেহ তাঁহার ডাকে উত্তর দিল না। চলিয়া যাওয়াটা ভাল হয় না বিবেচনা করিয়া, দরজার বাহিরে নরেন্দ্রনাথ, আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়ার মত মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন,—হাতে নয়, পায়ে। অধিক ক্ষণ তাঁহাকে দাঁড়াইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হইল না, সৌভাগ্যক্রমে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই অতুলদের দাসী, ক্ষীরো, একটা ডোঙা হাতে করিয়া বাহির হইতে আসিল। নরেন্দ্রকে দেখিয়া বলিল "আপনি এসেছেন? আমি যাই, মাকে বলিগে।" নরেন্দ্র যাহা করিতেছিলেন, তাহাই করিতে থাকিলেন।

একটু পরে ক্ষীরো আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। একটা ঘরের মধ্যে জলখাবার

সাজান ছিল, এবং সেই খানে, একখানা গালিচার আসন পাতা ছিল। ক্ষীরো নরেন্দ্রনাথকে সেই আসনে বসিতে বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে গেল। স্রোতের মধ্যে কঞ্চি, কি সেই প্রকার অন্য কোন বস্তু পোঁতা থাকিলে, তাহার উপরটা যেমন করে, নরেন্দ্রনাথ আসনে বসিলে পর তাঁহার চক্ষু সেই রূপ করিতে লাগিল। 'খাই কি না খাই, কার কথায় খাব' নরেন্দ্র এই প্রকার ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে ফুস্ ফুস্ শব্দে "খাওনা, বাবা; তুমি ঘরের ছেলে, তোমার আবার লজ্জা কি?" তাঁহার কানে বাজিল। এত মিষ্ট কথার জন্য কাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন, এই নিশ্চয় করিবার অভিলাষে শব্দের দিকে, তাঁহার নয়নে যতদূর হইতে পারে, আড় করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দীপছায়ায় প্রথমে দেখিতে পান নাই, যে তাঁহার সাড়ে চারি হাত আন্দাজ অন্তরে বাম দিকে, নাকের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ঘোমটায় ঢাকিয়া এক জন স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। নরেন্দ্র যখন তাহাকে দেখিলেন, তখনই তাহাকে অতুলের মা বলিয়া নরেন্দ্রের বিশ্বাস জন্মিল; বাস্তবিক তিনি অতুলের মা। নরেন্দ্রের জলযোগ চলিতে লাগিল।

ফুস্ ফুস্ হইতে ক্রমশঃ প্রায় গর্জ্জন পর্য্যন্ত অতুলের গর্ভধারিণীর গলা উঠিল, এবং তাহার মধ্যে অনেক বিনয়ের সহিত এই কথাগুলি বলা হইল;—অতুল শিশু, অতুলের অভিভাবক কেহই নাই; বছর ঘুরিয়া গিয়া পুন-

র্ব্বার বছর যাইতেছে, তবু জামাইটীর কোন খবর পাওয়া যায় নাই ; তিনি কোথায় থাকেন, তাহাও জানা নাই. তা না হ'লে লোক পাঠান যেত ; অতুলের লেখা পড়া কিসে হবে ; ঘাড়ীর খরচ পত্রই ভালরূপ চলে না ; বিমলার অসুখ, খেতে রুচি নাই, খেলেই বমি হয়, মুখ শপ্ শপ্ করে ; দিন দিন যে কেমন কেমন হয়ে যাচ্ছে, রং হচ্ছে যেন কাঁচা হলুদ বাঁটা, গায়ে যেন রক্তমাত্র নাই ; এখন কি যে হবে, ভেবে অস্থির ; যাতে মেয়েটী বাঁচে, আর ছেলেটী মানুষ হয়, তা নরেন্দ্রকে করিতেই হইবে ; নরেন্দ্র না করিলে আর কে করিবে ; এখন ছেলে আর মেয়ে নরেন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ, রাখিতে হয় নরেন্দ্র রাখিবেন, মারিতে হয় নরেন্দ্রই মারিবেন ; মেয়ে মানুষের সহায়ও নাই, সম্পত্তিও নাই।

নরেন্দ্রনাথ কিছুই খাইতে পারিলেন না ; যাহা মুখে দেন, তাহাই যেন গালের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় ; আহ্লাদেই তাঁহার পেট ভরিয়া গেল ; একটা সন্দেশ-আস্ত গিলিতে গিয়া নরেন্দ্রনাথের চক্ষুর্দ্বয় আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নরেন্দ্র মনে করিলেন "আহা! ইহাদের কি সৎ স্বভাব! অনায়াসেই ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনা যাইবে। পাপময় কুলপ্রণালীতে ইহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং করিতেছে। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার উপায় নাই, এখন যাহাদিগকে উদ্ধার করিলে দেশের মঙ্গল, তাহারা

আর হীনাবস্থায় হিন্দু কুসংস্কারের জালে জড়িত হইয়া কষ্ট না পায় ইহা করা চাই” এই সংকল্প করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন “পরের হিতের জন্য মনুষ্যের জন্ম; ধর্ম্মই আমার ব্রত; আপনি স্বয়ং আমাকে ডাকাইয়া আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। আপনার হিতের জন্য আমি প্রাণ-পণে যত্ন করিব, তাহার চিন্তা নাই। অতুল পড়িতে যায় না, কিন্তু ছেলে মানুষ, একটু জ্ঞান হইলে অবশ্যই যাইবে। যাই হউক, যত দিন না যাইতে চায়, আমি অব-কাশক্রমে সন্ধ্যার পর আসিয়া প্রত্যহ তাহাকে পড়া বলিয়া দিয়া যাইব, সে জন্য ভাবিতে হইবে না। আর বিমলার অসুখ, তা, তা অবশ্যই শীঘ্রই সারিয়া যাইবে; তবে কিনা, এমন কিছু শক্ত নয়, কিন্তু এক বার দেখিলে ভাল হয়; পীড়াটা কি, তার নিরূপণ করিবার জন্য রোগী দেখাটা দরকার।”

নরেন্দ্রনাথ এক গুলিতে হাজার কাক মারিলেন। এক কোপে বল্লাল এবং অবল্লাল সকলেরই চৌদ্দ পুরুষকে কাটি-বার জন্য খড়্গ তুলিলেন। নরেন্দ্রনাথের দল হইতেই ভারত-বর্ষ আলোকে ঝলসিয়া যাইবে। সাধু! সাধু!

অতুলের মা ব্যগ্রভাবে নরেন্দ্রের কথায় সম্মতি দিলেন। অন্য একটা ঘরে গিয়া বিমলাকে দেখাইলেন; বিমলা ঘাড় তুলিল না, কথা কহিল না। সে দিনকার মত নরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। তার পর অবধি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র

অতুলদের বাড়ীতে ঘড়ীর কাঁটার মত হাজির হইতেন। কিন্তু অতুল নরেন্দ্রের পূর্ব্বপ্রেম ভুলিতে পারে নাই; সে জন্য অতুল বিকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বাটীতে থাকিত না, নরেন্দ্রনাথও তাহার জন্য অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহাদের বাটীতে থাকিতেন, শেষে তাহাকে না পাইয়া কাজে কাজেই রোজ ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। তথাপি অতুলের বিদ্যা বুদ্ধি বাড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বিদ্যালয়ে দেখিতে পাইলে, আর পূর্ব্বের ন্যায় মারিতেন না, বরং সকল বালক অপেক্ষা তাহাকে আদর ও স্নেহ করিতেন; ইহাতেই আমরা বুঝিয়াছি যে অতুলের বিদ্যা বাড়িতেছিল।

# দশম পরিচ্ছেদ।

## "অঘটন ঘটালে বিধি"।

পৌনঃপুনিক দশমিকের ন্যায় দিন যায়, রাত্রি আইসে। পৌনঃপুনিক দশমিকের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ অতুলদের বাড়ী যান, এবং বাসায় আইসেন। যে কারণে নরেন্দ্রনাথ যান, তাহার কার্য্য কি হয় বলা যায় না, কিন্তু কারণের ধ্বংস হয় না। অতুলের বিদ্যা বিলাতী বটের আটার মত স্থিতি-স্থাপক, নতুবা এক দিন গিয়া নরেন্দ্রনাথ, যে টুকু বাড়াইয়া আইসেন, তাহারই জন্য আবার যাইতে হইবে কেন? আর বিমলার পীড়া?—তাহা ত শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় প্রতিক্ষণেই বাড়িতেছিল। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে, যে যদি পীড়ার কোন আনুষঙ্গিক উপসর্গ হইত, নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই তাহার প্রতীকার বা দমন করিতেন; তাহা না হইলে প্রতিদিন তাঁহার তত্ত্ব লইয়া ফল কি হইত?

ভাল মন্দ দুই প্রকারেরই লোক সকল স্থানেই আছে। রাজহাটের ৫।৭।১০ জন লোক (ইহার মধ্যে শতকরা ৯৯ জন স্ত্রীলোক) নরেন্দ্র নাথের কথা লইয়া কানাকানি করিতে লাগিল, কাজেই সে কথার একটু জানাজানিও হইল। কিন্তু রাজহাটের অধিকাংশ ব্যক্তিই ভদ্র, এজন্য অতুলদের বাটীর

কোন প্রসঙ্গ লইয়া কেহ কোন গোলযোগ করিল না। গ্রামের এক ব্যক্তি বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথের উপচিকীর্ষার গৌরব করিতে লাগিল।

গ্রামের লোকের ভদ্রতা ব্যতীত গোলযোগ না হইবার আরও একটী কারণ ছিল। কালীনাথ ধর মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বিবাহের পনর দিন পূর্ব্ব হইতে গ্রামে যেন ভূমিকম্প হইতেছিল; এজন্য লোকের অন্য অন্য বিষয়ে মন দিবার অবকাশ অতি অল্প ছিল।

ধরজীর পুত্র একটী মাত্র। যে পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও ধর মহাশয় রাজহাটে বিদ্যালয় স্থাপিত করেন, সে ছেলের বিবাহে কিছু ধুমধাম হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। ছেলের বয়স নয় বৎসর, শরীর কিছু রুগ্ন, পেটে একটু পাত পিলে. চোখ দুটী একটু কাঁওলা কাঁওলা, গলা কিছু সরু, হাত পাও একটু সেই রকম; কেবল পেটের ভিতরে পিলে, উপরে চামড়া, মাঝে কতক গুলি শির থাকাতে পেটটী কমে নাই। এই রূপ বিবিধ কারণ বশতঃ ধরজীর শূদ্রাণী (ব্যাকরণ-বিশারদ! ক্ষমা করিবেন) ছেলেকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং মরিবার পূর্ব্বে বউ ঘরে আনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ধরজীও ছেলেটীকে ভাল বাসিতেন, দেহের অনিত্যভাবও স্বীকার করিতেন; প্রপৌত্রাদির মুখ দেখিতেও ইহাঁর উৎকট বাঞ্ছা ছিল; যাহার ঐশ্বর্য্য থাকে, ছেলে মেয়ের সকালে সকালে

বিবাহাদি না দেওয়া তাহার মহাপাপ ; এবং নিজে তিনি ভাগ্যবান্ পুরুষ ও তাঁহার দরিদ্র ভায়ার অনেক গুলি, এ সমস্ত জ্ঞানও ধরজীর ছিল। সুতরাং ধরপত্নী নানা রূপ ছল কৌশলে স্বামির মন লওয়াইয়াছিলেন, .এবং পরিশেষে দুজনের মনে চাঁদ চকোরের মিলন হওয়াতে, বিবাহের কথা নিশ্চিত হয়।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই পাত্রী স্থির করা হইল। বিবাহের জন্য প্রজাদের নিকট চাঁদা আদায় হইতে লাগিল। গ্রামস্থ লোক ধরজীর প্রজা; এজন্য বলা হইয়াছে, পনর দিন পূর্ব্ব হইতে গ্রামে যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল। সাত দিন থাকিতে বিদ্যালয় বন্ধ হইল, নরেন্দ্র নাথকেও উৎসবে মাতিতে হইল। নৌবত বসিল, তেল হলুদের ছড়াছড়ি হইতে'লাগিল। বৃহৎ ব্যাপার, কেহ খাইতেছে, কেহ গালি দিতেছে, কেহ উপবাস করিয়াই দিন কাটাইতেছে, কেহ জল তুলিয়া কুলাইতে না পারিয়া বকিতেছে, কেহ বা অকারণে কলসী কলসী জল ঢালিয়া উঠান কাদা করিতেছে ; একটী স্ত্রীলোক চূড়া করিয়া চুল বাঁধিয়া ভাতের হাঁড়ি যেই নামাইতে গিয়াছে, অমনি ফেণ পড়িয়া তাহার দুই পা পুড়িয়া গেল, ভাত উননে পড়িয়া গেল, পাড়ার একটী গুজরাটী বউ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সেই দিকে দৌড়িতেছিল, উঠানে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, আর দশ জনে হাসিয়া উঠিল, গিন্নী গোছের একজন দেখিতে আসিল, তাহার

খোপার ফুল ভাঙ্গিয়াছে কি না; এক জনকে ডাকিয়া ডাকিয়া আর কয় জনের গলা চিরিয়া গেল; কতকগুলি আলস্যহীন স্ত্রীলোক, ধরপত্নীর বন্দোবস্তের প্রশংসা করিতে লাগিল। এ গণ্ডগোল এক দিন নয়, ক্রমাগত সাত দিন হইতে লাগিল।

ক্রমে বিবাহের দিবস উপস্থিত। সে দিনকার বন্দোবস্তের গুণে, কেহই কাহাকেও কিছু বলিতে বা কাহারও কোন কথা শুনিতে পারিল না। যে গ্রামে বিবাহ হইবে, তাহার নাম নিশ্চিন্তপুর, রাজহাট হইতে প্রায় ৩।৪ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ। সুতরাং মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব হইতে যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। হাতী, ঘোড়া, পাল্কী সব যুটিতে লাগিল; এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই আদেশ দিতে, পরামর্শ করিতে যখন সকলেরই গলা বসিয়া গেল, এবং কেবল মুখ খুলিয়া ও বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে পরস্পরের কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল, তখন———(সন্ধ্যার পরক্ষণেই)—রাজহাট হইতে বিবাহ রওয়ানা হইল। পূর্ব্বাবধি মন্ত্রণা স্থির-করা ছিল, সুতরাং নরেন্দ্রনাথ এক জন বরযাত্রী হইয়া এক খানি পাল্কী অধিকার করিলেন, গর্ণেটের চায়না কোটটী ছাড়িলেন না। বহুতর লোক সঙ্গে চলিল, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ধর মহাশয় স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া চলিলেন।

বাদ্যভাণ্ড, এবং আতশ বাজী অনেক প্রকার হইয়াছিল—"বিস্তারে বর্ণিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়"।

ইংরাজী পরিচ্ছদের সপ্তম নকলে ভূষিত হইয়া কতকগুলা মসীকৃষ্ণ পুরুষ লাল বনাতের অন্তরাল হইতে "গড়ের বাছের" পরিচয় দিতেছিল। কেবল তাহাদের মধ্যে এক জন একটা প্রকাণ্ড জয়ঢাক পিঠে করিয়া আগে আগে যাইতেছিল, এবং মাঝে মাঝে হস্তদ্বারা চক্ষুর জল মুছিতেছিল। একটা মুদ্গার হস্তে অপর এক জন সেই জয়ঢাকের উপর আঘাত করিতে করিতে চলিয়াছিল। যাহার পৃষ্ঠে জয়ঢাক, যাহার উপর আঘাত, কেবল তাহারই পোশাক ছিল না; ইংরাজের দলে সেই এক মাত্র বাঙ্গালী। বিবাহ কাণ্ডের মধ্যে ইহার তুল্য অবস্থা আর এক জনের,—সে কালীনাথ ধরের পুত্র, বিবাহের বর।

বিবাহের লগ্ন ভস্ম হইবার অতি সামান্য কাল পরেই, রজনী তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, যথা সময়ে নিশ্চিন্তপুরে বিবাহ পৌঁছিল। গ্রামের মধ্যে যে পথ দিয়া বিবাহ যায়, তাহারই দুই পার্শ্ব হইতে "অবগুণ্ঠবতী কুলবধূগণ" -- (গণ শব্দের ব্যবহার দেখিয়া কন্যা পক্ষীয় কেহ যেন ব্যাকরণের দোষ ধরিয়া, বিবাহ সভায় একটা লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত না করেন) - উঁকি দিয়া দেখিতে থাকে, এবং আমোদপ্রিয় দশ অবধি পঁচিশ বর্ষ বয়স্ক বালকগণ লোষ্ট্র নিক্ষপণ দ্বারা বরপক্ষীয়গণের বুদ্ধির পরীক্ষা করিতে থাকে। পাল্কীর দরজা খুলিয়া চিৎ হইয়া নরেন্দ্রনাথ ঘুমাইতে ঘুমাইতে যাইতেছিলেন। সোণার বেণের মন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ

কোমল ইষ্টকার্দ্ধ আসিয়া তদীয় উদরের উপর ধপ্ করিয়া পড়িল, তিনি জাগিয়া উঠিলেন, ক্ষেপণ কর্ত্তাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন, এবং স্থির করিলেন সে ব্যক্তি অবশ্যই এক জন "ভ্রাতার" মধ্যে, নচেৎ বিনা স্বার্থে তাঁহার এ প্রকার উপকার করিবে কেন? অর্থাৎ এই ইট খানি না থাকিলে এ গ্রামে (নিশ্চিন্তপুরে) কতগুলি স্ত্রীলোক স্বজাতির দুর্দ্দশা এবং সংসারের দুর্গতি এবং অবনতির সাক্ষী স্বরূপ আছে তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন না।

বিবাহের বাটীতে সকলে একে একে পৌঁছিল। ধর মহাশয় এবং নরেন্দ্রনাথ সর্ব্বশেষে পাল্কী হইতে বাহির হইলেন। চতুর্দ্দিকে স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি করিতেছিল, ইহাঁদের দুই জনকে দেখিয়া সকলে এককালে নিস্তব্ধ হইল। ইহাঁরাও ক্রমে সকলের সহিত আসন গ্রহণ করিলেন। নিশ্চিন্তপুরের একজন যুবক আপ্যায়িত করিয়া নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল "মশায়দের ক পুরুষ এ রকম"? আর এক জন চীৎকার করিয়া উঠিল "এমন বরযাত্র কটী"? তৃতীয় এক ব্যক্তি উত্তর দিল "জয়ঢাক সমেত তিন জন" বর কন্যা উভয় পক্ষের প্রায় ২০।২৫ জন সেখানে বসিয়াছিল; সুতরাং নানা প্রকার বিদ্যা ঘটিত আলাপ এবং বৈবাহিক-সরস-কথোপকথনে সে স্থানে একটী ছোট খাট হাট উপস্থিত হইল এবং সুশৃঙ্খল রূপে সকল কথার মীমাংসা হইতে লাগিল। দুইটী বাবু কলিকাতা হইতে পানগাছ

দেখিতে আসিয়াছিলেন, এবং অদ্যকার বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া জানিতে পারেন, যে তখন ধান্যের সময় নয়; সুতরাং ধান্য একবারে রোপিত হইলে চিরদিন বাড়িতে থাকে না। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা অবাক্ হন, এবং অদ্য তাহাই লইয়া খেদ করিতে ছিলেন। নিশ্চিন্তপুরের পাঁচ ব্যক্তি অবহিত চিত্তে ইহা শুনিতেছিল, এবং বাবুদ্বয় ধানের কলম লইবার যে বাঞ্ছা প্রাকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছিল।

এই রূপে শ্রেণীমত গোল হইতেছে, এমন সময়ে এক জন আসিয়া করযোড় করিয়া বলিল "বাড়ীর মধ্যে স্থান সংকীর্ণ, অনুমতি হয় ত পাত্র সভাস্থ করা যায়।" এই জিজ্ঞাসাটী বিবাহের অঙ্গের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে; ইহার উত্তরও তদ্রূপ—"কন্যা দেখ্‌ব না ত কি, তোমাদের দেখ্‌তে এসেছি, না কি?।" পাত্রকে এক জন কোলে করিয়া লইয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে বাটীর মধ্যে যাইবার জন্য আর কয়জন উঠিল;—তন্মধ্যে (বলিতে সাহস হয় না)—নরেন্দ্রনাথ! ইহারা যাইবার উপক্রম করিতেছে, অমনি গর্জ্জন করিতে করিতে এক জন দীর্ঘাকার পুরুষ আসিয়া, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল "একি ইয়ারকী? ভদ্রলোকের ছেলে, বাড়ীর মধ্যে যাবে কি? বড় একখান চালাকী কর্‌বে, ত একে একে গলাটিপি দিয়ে সকলকে টের পাইয়ে দেব।" মিষ্ট অভ্যর্থনা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে সকলের পশ্চাতে

সরিয়া পড়িলেন ; তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া একে একে সকলেই বসিয়া পড়িল, এবং পরস্পর কেহই যেন আসন ত্যাগ করে নাই, এই রূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। বেশীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথের মুখ আটা আটা করিতে লাগিল ;—তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন, বিকট পুরুষ তাঁহার হাটখোলার মিত্র রামদাস।

স্তম্ভিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ বসিয়া রহিলেন। নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে কেহ যেন জাগাইয়া দিল ; নরেন্দ্রনাথ বাপান্ত-বাগীশকে একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আজি রামদাসকে দেখিয়া ইহাঁর মন বাপান্তবাগীশময় হইয়া উঠিল। রাম-দাস কেন এখানে আসিল, কি রূপেই বা আসিল, নরেন্দ্র-নাথ কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। গোড়াগুড়ি রামদাসকে তিনি ভয় করিতেন ; এখন মনে হইল, নিশ্চিত বাপান্তবাগীশ রামদাসকে তাঁহারই অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিয়া থাকিবে।

বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল, বর বাসরগৃহে গেল। বাসরঘরে অনেক স্ত্রীলোক জমা হয়, এবং তাঁহারা সাবধান হইয়া কথা বার্ত্তা কহে না, ও স্ত্রীজনোচিত ব্যবহার করে না। তাহারা আমাদিগকে লজ্জা ভয় না করে, নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। ভরসা করি, কোন পাঠকের বেআদবী আমাদিগকে মাফ করিতে হইবে না।

ক্রমে আহারাদির জন্য স্থান করা হইল; বাহির বাটী হইতে সকলকে ডাকিয়া আনা হইল, কেবল নরেন্দ্রনাথ রামদাসের ভয়ে রাত্রি প্রভাতের আপত্তি করিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাইবে? রামদাস বহুতর পরিশ্রমে কাতর হইয়া, সেই স্থানেই বিশ্রাম করিতে আইল। রামদাসকে পুনর্ব্বার দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ হা'ল ছাড়িয়া দিলেন।

রামদাস প্রথম বারে "মাইডিয়ারকে" দেখিতে পায় নাই। এবার দেখিতে পাইল; চীৎকার করিয়া উঠিল। রামদাসের বিশ্রাম-লালসা দূর হইল।

হতাশ্বাস হইয়া নরেন্দ্রনাথ রামদাসের সহিত আলাপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রামদাসপক্ষে আলাপের ঝড় বহিতে লাগিল, নরেন্দ্রপক্ষে আলাপের প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া এদিক ওদিক করিতে লাগিল। বিস্ময়ের সহিত নরেন্দ্রনাথের সমুদায় অবস্থার কথা রামদাস জানিতে ইচ্ছা করিল; নরেন্দ্র যথাসম্ভব উত্তর দিয়া মৌনী হইলেন।

রামদাস কলিকাতার সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিল। গল্পের প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ একটী সুমিষ্ট সংবাদ জানিতে পারিলেন। সংবাদটী এই;—কলিকাতায় এবার ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, হরিদাস ঘোষ ইস্কোয়ের, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট সেই ভয়ে কিছু অধিক পরিমাণে সুরা সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক রাত্রিতে * * এর বাটীতে আমোদের ছড়াছড়ি হইতেছিল, রামদাসও সেখানে

উপস্থিত ছিল। হরিদাস বাবুও ছিলেন, কিন্তু গুলাউটার প্রতীকার অধিক পরিমাণে তাঁহার উদরস্থ হয়। সেই জন্য হরিদাস উড়িবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু বহুকালের এই প্রস্তাবে আজি পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই বলিয়া রামদাস প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব অপারগতা জানাইল। হরিদাস ক্ষান্ত হইল না, উড়িল। অমনি বারাণ্ডার উপর হইতে রাস্তার উপর পড়িয়া গেল। এক জন পাহারাওয়ালা পরক্ষণেই উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে পতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায়, হরিদাস মৃদু-জড়িত স্বরে উত্তর দেন "বাবা, পক্ষীজাতি। রাত্রিকালে অন্ধ হয়, একথা মনে ছিল না। এই ভোর হবে, আর উড়ব।" সত্য সত্যই তাহাই হইল; প্রভাত হইবামাত্র হরিদাসের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল। একটা মানুষের মত মানুষ, তায় এক জন প্রধান যজমানের মৃত্যু হইল, উপরন্তু, কলিকাতায় নানারূপ আপদ বিপদ, উপস্থিত গুলাউঠা, চারি দিক বিবেচনা করিয়া, উক্ত ঘটনার দুই দিন পরেই, বাপান্তবাগীশ সপরিবারে কাশীবাস করিতে চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না। হরিদাসের মৃত্যু বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়াতে আরও দুই তিন জনের নাম অকারণে উপস্থিত হইয়াছে, এবং পুলিস তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যত্ন করিতেছে। ৫। ৬ দিন এখানে সেখানে থাকিয়া আগুণ নিবিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত রামদাস নিজ

শ্বশুরালয় নিশ্চিন্তপুরে থাকিবেন; আর দুই জন ভদ্রলোক যাহাদের নাম হইয়াছিল, তাহারও রামদাসের সঙ্গে, এই খানে আসিয়াছে। কলিকাতার এক চিঠিতে রামদাস সংবাদ পাইয়াছে, আর কোন গোলমাল নাই। অতএব সত্বর কলিকাতা যাইবার সম্ভাবনা। নরেন্দ্রনাথ আর কত দিন এ দেশে থাকিবেন? নরেন্দ্র তাহা নিশ্চিত বলিতে পারেন না।

আজিকার মিলনে এত সুখ হইবে, ইহা নরেন্দ্রনাথের স্বপ্নের অগোচর। "সত্যমেব জয়তে"—বলিয়া নরেন্দ্রনাথ আহ্লাদে গলিতে লাগিলেন।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

## উদ্দেশ।

রেলেরগাড়ীর সহিত শূকরীর বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। উভয়েই একগুঁয়ে; বেগে দৌড়িয়া যায়, এবং যাইবার সময় সম্মুখ ভিন্ন পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপও করে না, এবং অভিমুখ পথের এক পাও এদিক ওদিক ব্যতিক্রম করে না। তদ্ভিন্ন

একবার মাত্র প্রসব করিলে উভয়েই এক একটী ষষ্ঠীদেবীর প্রতিপালন করিতে পারে।

হে বাষ্পীয় শকটারোহি-পাঠকবৃন্দ! এবম্বিধ অলঙ্কার প্রয়োগ দেখিয়া এ অধীনের প্রতি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইবেন না। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, মধুসূদন ও গবেশ-চন্দ্রকে গাড়ীর গর্ভে নিহিত করিয়া, আমারা অন্যান্য কথা বলিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহাদের গর্ভযন্ত্রণা ভোগের কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদেরই জন্য উপরি-উক্ত উপাদেয় উপমার সমাবেশ করা হইয়াছে।

গাড়ী-শূকরী প্রসববেদনায় কাতরা হইয়া হাওড়া ষ্টেশনের সমীপবর্ত্তিনী হইলে মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; এবং ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ এ দিকেই গুটীকতক শ্বেত সন্তান বাহির হইয়া পড়িল। ক্রমে যখন ষ্টেশনের ভিতরে গাড়ী গেল, তখন অন্যান্যের পর মধুসূদন ও গবেশচন্দ্রকে টানিয়া বাহির করা হইল। ভূমিষ্ঠ হইয়াই সকলে কোলাহল করিতে করিতে দৌড়িল; এবং আমাদের বন্ধুদ্বয় আর দশ জনের সঙ্গে গঙ্গা পার হইয়া মহানগরীতে উপস্থিত হইলেন।

তখন ভোরের সম্মানে তোপ পড়িল। এক দল ব্যব-সাদার আধলা পয়সার রাশি করিতে লাগিল; ভারবাহনে ভগবতীর অংশ সকল কলিকাতার বাহান্নপীঠে চলিতে লাগিল; বসাচোখ, শুষ্কমুখ, ঈষট্টলপদ বাবুগণ, পাগড়ীরূপে

মাথায় চাদর বান্ধিয়া আপন আপন বাসার দিকে চলিতে লাগিলেন; অধিকাংশ ব্যক্তি একে একে জাগিতে লাগিল, এক শ্রেণীর লোক ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। গবেশচন্দ্র একবারমাত্র কলিকাতায় আসিয়াছিল, "হাটখোলার কোন রাস্তা," এবং "এক খানা গাড়ী না হইলে যাওয়া যাইবে না," ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। একটা টাকা অকারণে গেল, মধুসূদন তাহাই ভাবিতেছিল। অবশেষে গবেশ মুখ ফুটিয়া গাড়ীর কথা বলিল, মধু সাহস করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিল। অগত্যা এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহারা দুই জনে উত্তর মুখে চলিল।

হাটখোলায় পৌঁছিয়া এক জন দোকানদারকে গবেশ-চন্দ্র জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিয়া দিল, "হাটখোলা ফেলে এলে, বরাবর দক্ষিণ মুখে যাও"। উপদেশ মতে উভয়ে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু এক রশি পথ যাইতে না যাইতে আহিরীটোলার ঘাটে এক খানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া গবেশের অত্যন্ত কষ্টবোধ হইয়া উঠিল, আর হাঁটিতে পারিল না। ছয় আনা ভাড়া সুস্থির করিয়া উভয়ে হাট-খোলা যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিল। সুবুদ্ধি গবেশচন্দ্র মধুকে বলিল "এ কলিকাতা; এখানে তোমার মত লোকের কর্ম্ম নয়; তুমি যদি একলা হইতে, তাহা হইলে এই টুকু-পথের জন্য এক টাকা, অভাবে বার আনা ভাড়া তোমার গালে চড় মারিয়া লইত।" "আমি হেঁটে যেতাম" বলিয়া

মধুসূদন নীরব হইল। নিমেষ মধ্যে গাড়ী হাটখোলায় পৌঁছিল; কিন্তু গাড়ীওয়ান দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাঁদের নিরূপিত বাটীর সম্মুখে ইহাঁদিগকে নামাইয়া দিয়া, একটু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লইল।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত গদিয়ান বাবুর নিকটে গবেশ রায় এবং মধুসূদন উপস্থিত হইলে, উভয়েরই আনন্দের সীমা রহিল না। গবেশ পথের ক্লেশ হইতে এবং মধুসূদন মোটের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইল। অনেক আলাপ, আপ্যায়িত, ইত্যাদি শিষ্টাচার প্রদর্শনে কোন পক্ষই জয় লাভ করিতে না পারিয়া, অগত্যা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নরেন্দ্রনাথের কথা পড়িল! বিবিধ সন্দেহ, অনেক তর্ক-বিতর্ক এবং আন্দোলনের পর স্থির হইল, যে আপাততঃ নরেন্দ্রনাথের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; সুতরাং এখানে থাকিয়া দুই এক দিন দেখা কর্ত্তব্য। এই পরামর্শ স্থির হওয়াতে মধুর কিঞ্চিৎ সন্তোষ জন্মিল; যে কয় দিন সহোদরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, সে কয় দিন সহোদরের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। গবেশের পরম আহ্লাদ হইল; এই দুই চারি দিবসে যেমন হউক দশ জন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় এবং আমোদ প্রমোদ হইতে পারিবে।

মধুসূদন এবং গদীয়ান বাবু বিকালে নরেন্দ্রনাথের বাসা বাটীতে গেলেন। সেখানে নরেন্দ্রকে পাওয়া গেল না,

নরেন্দ্রের কোন লক্ষণ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। ভিতর হইতে বামাস্বরে "কেএ গা?" শুনিয়া ইহাঁরা প্রবেশ করিতেও পারিলেন না। গবেশ ইহাঁদের সঙ্গে যান নাই; "ইতিমধ্যে" নরেন্দ্রনাথ যদি হাটখোলার বাসাতে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে দেখিবে কে? অগত্যা গবেশ গদীয়ান বাবুর বিছানায় শয়ন করিয়া ছিল। প্রতিদিন অনুসন্ধান হইতে লাগিল। মধুসূদনের কষ্টের পয়সা; মধুসূদন পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতার গলি গলি যেখানে যেখানে নরেন্দ্রনাথের যাইবার বা থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিতে লাগিল; যে ব্যক্তিকে মধু যে দিন সঙ্গে লইত, সে আর দ্বিতীয় দিন মধুর সহিত আলাপ করিত না। গবেশচন্দ্রের নিকট মধুসূদনের "যথা সর্ব্বস্ব" ছিল; সুতরাং মধুর উপকার না করিলে কৃতঘ্নতা হইবে ভাবিয়া গবেশও প্রতিদিন গাড়ী করিয়া গড়ের মাঠে, রাজেন্দ্র মল্লিকের বৈঠকখানায় এবং চিড়িয়াখানায়, সাতপুকুরের বাগানে এবং আরও বহুতর স্থানে নরেন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত।

এক দিন স্নানাদির পর গদীয়ান বাবু, মধুসূদন ও গবেশচন্দ্র রাস্তার দিকের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তামাকের ধূঁয়ায় স্ব স্ব অন্তরাকাশে উদিত নরেন্দ্রের-জন্য-ভাবনা-মেঘের বৃদ্ধি করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই গবেশের ফুস্ ফুস্ হইতে প্রবোধ-বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। "খুঁজিলেই যদি

পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবনা কি ? আমি কি রাজ্য খুঁজি না ? (মধুর প্রতি) তুমি কি চটের দোকান ছাড়িয়া একটু বড় গোছের কারবার খোঁজ না ? এ ত দুরাশা নয়, তবে কেন হয় না?—ভোগ, যত দিন ভোগ পূর্ণ না হয়, তত দিন ভুগিতে হয়। এ কথা তোমার আমার মত লোকের নয়, মিশর দেশীয় এক জন মহাকবি, উনপঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। আর এক কথা ;—বর্ত্তমান অবস্থায় তুষ্ট থাকা উচিত, যখন যাহা আছে, তখন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে—(গবেশের নিকট মধুর কয়েকটী টাকা এখনও আছে)—এ কথাও এক জন মার্কিন দেশীয় পণ্ডিতের ; দেশ ছাড়িয়াই বা কাজ কি ? স্বয়ং পরাশর বলিয়াছেন 'আত্মতুষ্টে জগৎ তুষ্ট'। তবে কেন ? যাহার যাহা আছে, তাহাতে ক্ষান্ত হইতে হইবে। এখন আমাদের নরেন্দ্র নাই, সুতরাং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। না হও, ইহার প্রতিফল অবশ্যই পাইবে, অর্থাৎ আন্তরিক অসন্তোষ, মনের অসুখ নিশ্চিত ভোগ করিতে হইবে। সেই জন্য আমি বলি যে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যাউক, সময়ে নরেন্দ্রকে অবশ্যই পাওয়া যাইবে। একে ত নরেন্দ্রের জন্য আমাদের মনের কষ্ট, তাহার উপর শরীরে কষ্ট দিলে ক্ষতি বই লাভ নাই। আমার কথা শুনিতে না চাও, উত্তম ; কিন্তু আমি আর ঘুরে ঘুরে বেড়াইতে পারি না।"

গবেশ! তোমার পেটে এত সার! হে অস্মদ্! হে উত্তম পুরুষ! তুমি কেন এত লিখিয়া তোমার অঙ্গুলিকে কষ্ট দিতেছ? যে জন্য লিখিতেছ, তাহা কি খুঁজিলে পাইবে? যখন পাইবার হইবে, আপনিই পাইবে। তবে কেন? আবার কেবল তোমার কষ্ট নয়। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"! নির্জীব পক্ষীর পালককে কাটিয়াছ, চিরিয়াছ; তাহাকে ঘর্ষণ করিতেছ। তোমাকে উপদেশ দিতেছি, লেখা ছাড়িয়া দাও। আমার কথায় না ছাড়, শেষে সমালোচক মহাশয়ের তাড়ায় ছাড়িবে; তাহা কি তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে? অহং ত তখন ঘাড় তুলিতে পারিবে না? নিজের কিছু অর্থ এবং সুখ্যাতির লোভে এবং দেশের উপকারে যদি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলেও বলি, ঢের হয়েছে, এখন ইস্তফা দাও। অনেক উপায় আছে, যদ্দ্বারা দেশেরও কল্যাণ হয়, আপনারও হিত হয়; ইহার মধ্যে একটী অবলম্বন কর, দোষ দিব না। ঐ দেখ, পাঠক, বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী,—তাহারাও ত লেখা পড়া রীতিমত করিয়াছে? - কেমন অজ্ঞানতিমিরাবৃত দেশে বোতল বোতল সভ্যতা ও জ্ঞানের আমদানী করিয়া মামাত ভ্রাতাদের (অর্থাৎ সূর্য্যিমামার দেশের লোকের) নিকট দিনে দিনে পরিবর্দ্ধনশীল আদর লাভ করিতেছে, পয়সাও পাইতেছে। আরও উপায় আছে; রাধাচরণ থানাদার ঘুস্ লয় না; প্রাণান্তে কাহারও সম্মান করে না, ফল কথা, কাতে

পাইলে কাহাকেও ছাড়ে না। তাহার বিরুদ্ধে কেন বিনামী দরখাস্ত দাও না? সে বশীভূত হউক না হউক——আর, হইবে না, এ কথাও নিশ্চিত—তোমার ত কাজ হইবে। দেখ দেখি ভবানীরঞ্জন ঐ পথ অবলম্বন করিয়া কি না করিল? দশ জনে চিনিল, গৌরব বৃদ্ধি হইল, গরিব উল্লার সর্ব্বনাশ করা হইল, নিজের কিছু লাভও হইল। এক এক করিয়া কত বলিব, এমন দশ হাজার সদুপায় আছে। কোনটাই ভাল না লাগে, তুমিই উৎসন্ন হইবে।

এত বলিলাম, উত্তম পুরুষ মানিল না। গণেশ এত উপদেশ দিল, সব "ভস্মে ঘৃত" হইল। আমি লিখিতে থাকিলাম, গদীয়ান বাবু এবং মধুসূদন নরেন্দ্রের জন্য ভাবিতে লাগিলেন।

গদীয়ান বাবু বলিলেন "রামদাস কিছু দিন হইতে নিরুদ্দেশ; নতুবা তাহার নিকট সন্ধান পাইলেও পাওয়া যাইতে পারিত। আমার বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ তাহারই খপ্পরে পড়িয়াছে।"

এই রূপ সকলে ভাবিতেছেন, পরামর্শ করিতেছেন, আবার ভাবিতেছেন, এমন সময়ে—বিধাতার কৌশল!—গদীয়ান বাবু দেখিলেন রামদাস পথ দিয়া যাইতেছে। রামদাসকে উচ্চস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু রামদাস শুনিয়াও শুনিল না, ফিরিয়াও চাহিল না। গদীয়ান বাবুর এক যোড়া শাল লইয়া যাওয়া অবধি, রামদাস তাঁহার সহিত

আলাপ করিত না, তাঁহার মুখাবলোকন করিত না, তাঁহাকে মনে মনে ঘৃণা করিত। পুনঃ পুনঃ আহ্বান করাতে রামদাস শুনিতে পাইল, কিন্তু ঘাড় না তুলিয়াই "আস্‌ছি—এই একটু কাজ আছে" বলিয়া চলিতে লাগিল। তাহাতেও গদীয়ান বাবু ছাড়িলেন না, অগত্যা রামদাস সাহসে ভর করিয়া উপরে আসিল।

রাম। 'কি মহাশয়? নয় আমরা দুঃখী লোকই, তা বলিয়া কি পায়ে ঠেল্‌তে হয়? কি এমন করেছি, যে দশ জনের সাক্ষাতে, যা নয় তাই —।"

গদীয়ান। 'কৈ রাম বাবু, আমিত তোমায় কিছুই বলি নাই। শালের কথার কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত করি নাই। তবে চট কেন? তোমায় দেখ্‌তেই পাই না, তা বল্‌ব কবে?— এখন সে কথার জন্য তোমায় ডাকি নাই; আমাদের নরেন্দ্র-নাথের কোন খবর বলিতে পার?

রাম। 'আপনাদের নরেন্দ্র আপনারাই জানেন, আমি গরিব লোক, আপন লইয়াই শশব্যস্ত, পরের কথায় আমার কি কাজ। আমরা জল-পুরিয়াও খাই না, বাবু বাবড়ার খবরও রাখি না।'

গদীয়ান বাবু বুঝিলেন। শাল কখনও ফিরিয়া পাইবেন, তাঁহার এ দুরাশা কোন দিন হয় নাই। এজন্য রামদাসকে সে শাল ছাড়িয়া দিলেন, এবং পুনর্ব্বার বিনয় পূর্ব্বক নরেন্দ্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছু ইতস্ততঃ করিয়া

এবার রামদাস বলিয়া দিল। পর দিবস সকালে গবেশ ও মধুস্থদন নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে রাজহাট যাত্রা করিলেন।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### সাধ পূরিল।

কালীনাথ ধরের পুত্রের বিবাহ হইয়া গেলে বর, কন্যা, বরযাত্রী প্রভৃতি সকলে রাজহাটে আসিল। বেলা দেড় প্রহরের সময়ে বাদ্যভাণ্ড করিতে করিতে ইহারা যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন আগন্তুক কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিলে চৈত্র মাসের শঙের ব্যাপার অবশ্যই মনে করিত। দলের মধ্যে কাহারও আগাগোড়া সাদা কাপড় ছিল না। কেহ আপাদ মস্তক লাল, কেহ গোলাপী, কেহ চিতা বাঘের মত লোহিত, পীত, কপিশাদি বিবিধ রাগরঞ্জিত। একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আধপোড়া হাঁড়ীর মত দেখাইতেছিল, এবং তাঁহার নিতম্বের উভয় পার্শ্বে পরিধেয় বস্ত্রোপরি, দুইটা সিন্দূরাভ ফুল কাটা হওয়াতে তাহার রূপ যেন সত্য সত্যই ফাটিয়া পড়িতেছিল। সকল পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখা

গেল, এই বিবাহের উপলক্ষে কন্যা পক্ষীয়ের বহু টাকার চূণ, হরিদ্রা, ম্যাজেণ্টা, হাঁড়ীর কালী, লাউএর বোঁটা প্রভৃতি নষ্ট হইয়াছে।

বিবাহ ধর মহাশয়ের বাটী পৌঁছিল। হুলুধ্বনিতে পাড়া নিস্তব্ধ হইল; একটী স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে শিশু কাঁদিতেছিল, কিন্তু বোধ হইল যেন শিশু অকারণে হাঁ করিয়া আছে, ক্রন্দনের যে কিছু শব্দ তাহা হুলুতে ডুবিয়া গিয়াছিল। যখন বর কন্যা বাটীর অভ্যন্তরে আসিল, তখন শব্দ দ্বিগুণ বাড়িল। বোধ হইল সহস্র সহস্র চিল কাক পরস্পরের সহিত যোগ-সাজশ করিয়া একবাক্যে কাকলির পঞ্চম দেখাইতেছে। বস্ত্রাভরণভীষণা ধরগৃহিণী হেনকালে বউ ঘরে লইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রমণীর কোমল হৃদয়ে কত সহ্য হইবে? ধরপত্নী বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন!—পুত্রবধূ শ্যামোজ্জ্বলাঙ্গী, সন্নমিত-পল্লববিশাল নয়না, বাটালিকাটা নাসা; বালিকার ঠোঁট দুখানি পাতলা, রাঙা, সস্মিত মুখে দন্ত দেখা যাইতেছে, যেন শুক্তির ভিতর মুক্তা।—এ বউ লইয়া ধরগৃহিণী কি করিবেন? এই কালো বউ লইয়া কি তিনি জন্ম জ্বলিবেন? তাঁহার মরণ কেন হয় না? ঐ ছেলের কি এই বউ? এই সোণার চাঁদের এই বানরী? আ কপাল! এই জন্য কি তাঁর এত সাধ? আর এত সাধে কি এই বাদ বিধাতার মনে ছিল? যাহার মন হয় লউক, ধরগৃহিণী এ

বউ ঘরে লইবেন না; এ বউ লইয়া এক দিনের—এক বেলার তরেও ঘরকন্না করিবেন না; ঘর ছাড়িতে হয়, দেশ ছাড়িতে হয়, বনে যাইতে হয়, তাহা যাইবেন, সব করিবেন, এই বউ লইয়া এক ঘরে, এক বাড়ীতে থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার কপাল এত মন্দ তাহা তিনি জানিতেন না।

নারী মহলে কলরব—কোলাহল উঠিল। ধরগৃহিণীর দুঃখে সকলেই কাতরা হইল, অধীরা হইল; তথাপি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বধূনিন্দা করিয়া সকলে প্রবোধ দিতে লাগিল, এবং কাঁদিতে লাগিল। সেই নয়ন-মেঘের ঘটায় যেন সদ্যঃ বর্ষা উপস্থিত হইল; তাহাতে নিশ্বাসরূপ প্রবলবায়ু, এবং প্রবোধচ্ছলে ঘন-গর্জ্জন। কি একটা কাণ্ডই উপস্থিত হইল; কলরব বাহির বাটীতে প্রবেশ করিল। ধর মহাশয় বাটী পৌঁছিয়া আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ অন্দরে আসিলেন। বালিকা নববধূ কাঁদিয়া উঠিল। ধর মহাশয় প্রথমে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না; নির্জ্জীব স্তূপাকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে হৃদয়াধিকারিণী প্রেয়সীর রোদন মধ্যে এই মর্ম্ম বাছিয়া বাহির করিলেন, যে বধূ তাঁহার মনোমত হয় নাই, এবং এক মাসের মধ্যেই পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে হইবে। অগত্যা ধর মহাশয় তাহাতেই প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সব গোল চুকিয়া গেল। বর্ষা গতে শরৎ আসিল; বাটীতে সকলেই হাসিতে লাগিল, সকলের নয়নের নিম্নভূমি শুষ্ক

হইল; শোভাময় ধান্য ক্ষেত্রের ন্যায়, বাটীতে আনন্দের ঢেউ খেলিতে লাগিল।

অনেক গ্রন্থকার পাঠক পাঠিকাদিগকে কাঁদাইতে ভাল বাসেন; তাঁহাদের কোমল চক্ষুর জল বাহির করিবার জন্য যত্নও করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। কিন্তু অসাধারণ সৌভাগ্য বলে, আমাদিগকে সে বিষয়ে প্রয়াস পাইতে হইবে না। যিনি ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করেন, তিনি সহজেই রোদন করেন। আর, অর্থ ব্যয় করিয়া আমাদের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিলেও যাঁহার কান্না না পায়, তিনি পরমহংস; কোন প্রকারের উপাখ্যানেই তাঁহাকে কাঁদাইতে পারিবে না, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস। এই সকল বিবেচনা করিয়া, নিষ্প্রয়োজনীয় বোধে, আমরা করুণরস লইয়া বড় একটা ঢলাঢলি এপর্য্যন্ত করি নাই। বস্তুতঃ আমরা উক্ত রসের পক্ষপাতী নহি, এজন্য পরেও তাহা লইয়া একটা গণ্ডগোল করিব না। নিম্নে যে বৃত্তান্তের সমাবেশ হইতেছে তাহা কাহাকেও খিন্ন বা রোরুদ্যমান করিবার মানসে নহে; প্রকৃত কথার অপহ্নব করা যাইতে পারে না বলিয়াই তাহা লিপিবদ্ধ হইল; কেহ যেন ইহাতে কোন রূপে দুঃখিত না হন।

ছেলের বিবাহ সম্বন্ধে ধর মহাশয়ের গৃহলক্ষ্মী অনেক সাধ করিয়াছিলেন; কিন্তু বউ কালো হওয়াতে সে সাধে বিষাদ জন্মিল; তাঁহার সুখের পথে কাঁটা পড়িল। পূর্ব্বেই

বলা হইয়াছে নববধূ বাস্তবিক গৌরাঙ্গী নহে; নাক, মুখ, চোখ যেমনই হউক, রংটা ফর্‌সা নয়, সুতরাং ধরকর্ত্রীর দুঃখও অলীক বলা যায় না। আপন ছেলেকে কেহ কখন মন্দ বা কুরূপ দেখে না, এই নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়াই সাধারণ মাতৃকুলের ন্যায়, ধর মহাশয়ের পুত্রের গর্ভধারিণী বউকে বিষ নয়নে দেখিয়াছিলেন। একে তাঁহার এই মনঃকষ্ট, তাহার উপর তদীয় মত বিরোধ করিয়া যন্ত্রণার বৃদ্ধি করা অন্যায় এবং অসঙ্গত, বিবেচনায় শ্রীযুত কালীনাথ ধর মহাশয় দ্বিতীয় পাত্রীর অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন; নানা দিক হইতে বার্ত্তা আসিতে লাগিল; অবশেষে এক স্থানে কথা বার্ত্তা এক প্রকার স্থির হইল, এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ হইবে এই রূপ মন্ত্রণাদি চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষের কর্ত্তা গিন্নীর মত হইল, কিন্তু কার্য্য গতিকে এই বিবাহটী ঘটিয়া উঠিল না।

ধর মহাশয়ের পুত্রের নাম গোবিন্দ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি গোবিন্দের পেটে প্লীহা ছিল; কিন্তু বালকের পীড়া বলিয়া কেহ সে বিষয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয় নাই। বিবাহে অনেক ধূমধাম হওয়াতে গোবিন্দের বড় আমোদ হইয়াছিল। রৌদ্র, জল কিছুই না মানিয়া গোবিন্দ যেখানে ইচ্ছা এ কয় দিন সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়াইত; যখন যাহা পাইত, তাহাই খাইত; কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিত না, কেহ নিষেধ করিলেও মানিত না। এই সকল

কারণে গোবিন্দের পীড়া কিছু প্রবল হইল। সেই অবস্থাতে বিবাহ হইয়া গেল; বিবাহের পর গোবিন্দ শয্যাগত হইল। তখনও দ্বিতীয় বিবাহের কথা চালাচালি হইতে লাগিল। ক্রমে কবিরাজ না ডাকিলে আর চলিল না। কবিরাজ আসিল, দেখিল, মাথা নাড়িল, চলিয়া গেল। এক কথা বলিয়া গেল "রোগ ভাল করিতে পারি, কিন্তু আয়ু দিতে পারি না"। বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই; বাস্তবিক এক্ষণ গোবিন্দের এই অবস্থা।

তখন গোবিন্দের পিতা মাতার চৈতন্য হইল। তখন বিবাহ গেল, কন্যা গেল, বৈবাহিক গেল, এক কালে সকল ঘুরিয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নব্য, প্রাচীন, সকল মতের চিকিৎসক আসিতে লাগিল। কিন্তু মানুষে কি করিবে? বালক দিন দিন অধিকতর রুগ্ন হইতে লাগিল; চক্ষুঃ পীতবর্ণ, সর্ব্ব শরীরে শিরা উঠিল, প্রত্যহ জ্বর, জ্বরের বিরাম নাই। তখন ঘর গোষ্ঠীর সকল সাধ এক দিনে ফুরাইতে চলিল। চিকিৎসকবর্গ একে একে জবাব দিয়া গেল। সেই দিন বিকালে গোবিন্দের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইল। রাত্রিতে আরও মন্দ; প্রভাত কালে, বালক পুনর্ব্বার সুস্থ হইল। পিতা মাতার দিকে সাশ্রু নয়নে চাহিয়া বালক বলিল "আমি আর বাঁচ্‌ব না?" বালকের ক্ষীণ তীক্ষ্ণ স্বরে পিতা মাতার মর্ম্ম ভেদ হইল, কেহ কোন উত্তর করিল না। বালক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল "আমার কেন বে দিলে?"

যম ইহাকে এই বিষম বাক্য বলাইল। বালকের সুস্থভাব ক্রমশঃ অপনীত হইতে লাগিল। দীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বক্ষণে যে রূপ উজ্জ্বল হয়; গোবিন্দ সেই রূপ সুস্থ হইয়াছিল মাত্র। ক্রমে বাক্যের জড়তা জন্মিল; মুখে ঘর্‌ঘরি ভাঙ্গিতে লাগিল; প্রাণবায়ু জন্মের মত নিরুদ্ধ হইল। বিবাহপ্রিয় পিতা মাতা চিরন্তনের জন্য শিক্ষা পাইল। আর কি করিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### "স্বর্গারোহণ পর্ব্ব"।

কালীনাথ ধরের পুত্রের জীবন এবং রাজহাটের বিদ্যালয়ের জীবন এক কালে শেষ পাইল। একত্রে উভয়ের "পঞ্চে পঞ্চ" মিশাইল। ধর মহাশয়েরই বাটীতে বিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল। সুতরাং যে যার ছেলে, তাহার ঘরে গেল। নরেন্দ্রনাথের রাজহাটে থাকিবার উপলক্ষটী লোপ পাইল। এ দিকে বিমলার পীড়া দিন দিন বাড়িতেছিল; এজন্য উভয়ে (বোধ হয় কোন পরামর্শ না করিয়াই) এক দিবস রাত্রি থাকিতে থাকিতেই গা তুলিলেন। সূর্য্য যখন

উদিত হইল, তখন পীড়াক্রান্তা এবং ধর্ম্মাক্রান্ত রাজহাটের চতুঃসীমার ২।৩ ক্রোশের মধ্যে অদৃশ্য। শুনিতে পাওয়া যায়, সেই রাত্রিতে এক জন লাল-পাগড়ী-নীল-জামাওয়ালা, কিছু "হাত" করিয়াছিল; এবং নারী মাত্রেই "স্ত্রী" পদ বাচ্য বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ স্বীয় বিদ্রোহী ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়াছিলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে গবেশ রায় ও মধুসূদন ঘটক রাজহাট পৌঁছিলেন, এবং যথা সময়ে অনুসন্ধানাদি দ্বারা জানিলেন, যে এখানকার বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছে, এবং নরেন্দ্রনাথ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্রকে এখানে পাওয়া যাইবে কি না, মধুসূদন সমস্ত পথ তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন; এই সংবাদে তাঁহার সমস্ত ভাবনা দূর হইল। গবেশ কেবল পথের কষ্ট চিন্তা করিতেছিলেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি ও সকল চিন্তা ত্যাগ করিলেন। উভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া তখন পরামর্শ করিতে বসিলেন। দুই জনের মতের বহু প্রকার বিভিন্নতা হওয়া প্রযুক্ত, পরিশেষে উভয়ে নির্ব্বিরোধে এই মীমাংসা করিলেন যে গবেশের সঙ্গে মধুসূদন পারিবেন না; অতএব কলিকাতা যাইবার প্রয়োজন নাই, বরাবর বাটী যাওয়াই কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক। নরেন্দ্রনাথ রাজহাটের একটী কলঙ্ক সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, রাজহাটের সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই জন্য তাঁহার স্বদেশীয় লোককে—বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তিকে,

তাঁহার অনুরূপ সম্মান সকলেই করিল। তাহাতে মধু এবং গবেশকে সে রাত্রিতে কাহারও ঘরের ভিতর কারারুদ্ধের ন্যায় থাকিতে এবং নিয়মবদ্ধরূপে আহারাদি করিতে হইল না; দুই জনে সচ্ছন্দে পরমানন্দে খোলা জায়গায় রজনী সুন্দরীর গাঢ় আলিঙ্গনে শুইয়া থাকিলেন, এবং যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু ভক্ষণ করিলেন। ইহাঁরা যখন স্বদেশাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন বিরহ চিন্তায় রজনীর মুখ পাংশুবৎ হইল।

কিরূপে ইহাঁরা রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলেন, কেমন করিয়া ইহাঁরা মেমারি ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলেন; কখন কি অবস্থায় ইহাঁদের তথা হইতে তিরোভাব হইল, এ সকল বিবরণ ইতিহাসে সবিস্তারে বর্ণিত আছে, এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি আমাদের পাঠক বর্গের মধ্যে যিনি এক মূহুর্ত্তে এই সমস্ত কথা অবগত হইবার মানসে সাত আট দিনের মধ্যে এই সম্বন্ধে "জ্ঞানলাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাদিগকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন।"

যাহা হউক, গবেশ এবং মধুসূদনের পুনর্ব্বার মেটে রাস্তা অবলম্বনীয় হইল। নির্ব্বিঘ্নে তিন দিন পথ বাহিয়া গিয়া অবশেষে দুই জনে অগ্রদ্বীপে পৌঁছিলেন। তাঁহাদের পথের দ্বিতীয় দিবসের বিকালে যে একটু ঘটনা হইয়াছিল, আমরা তাহাকে বিঘ্ন মধ্যে গণনা করি না; কিন্তু "বাহ

জগতের” সন্তোষার্থ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ঘটনাটী এই,——পথের ধারে একটী দোকান ছিল, গ্রাম সেখান হইতে কিছু অন্তরে। যাহার দোকান, অল্প দিন হইল তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল, এই কারণে তাহার মৃত পত্নীর এক বিধবা ভগিনী সেই দোকানে থাকিত, এবং মুদী স্বয়ং দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিত।

একটু মেঘ দেখিয়া গবেশ এবং মধুসূদন এই দোকানে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। গবেশের সকল বিদ্যাতেই পারদর্শিতা ছিল, স্ত্রীলোকের দোকান দেখিয়া, তাহার সহিত একটু রসিকতা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, গবেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, দোকান তাহার কি না? তাহাতে স্ত্রীলোকটী বলে, দোকান তাহার ভগিনী-পতির। “তবে তুমি শ্যালী? কুটম্বের টেক্কা?” মিষ্ট আলাপে তুষ্ট হইয়া রমণী বলিল “আ মর! এ মিন্‌সে কে রে?” এমন সময়ে বোঝা মাথায় মুদী আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণীকে কিঞ্চিৎ বিব্রত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল, সে কানে কানে কি বলিয়া দিল। গবেশ হুঁকা চাহিলেন; মুদী তদুত্তরে বলিল “আর হুঁকায় কাজ নাই, এর পর ঘাড়ে ধরে বের করে দিলে সে ভাল হবে?” সেই সময়ে একটু ঝড় উঠিল। মুদীর কথায় এবং ঝড়ে গবেশ ও মধুসূদনের পক্ষে মণিকাঞ্চন যোগ হইল। তাঁহারা সেই যোগে সেস্থান হইতে যাত্রা করিলেন।

ঝড় বাদলের কত গুণ, তাহা বর্ণিয়া শেষ করা যায় না। কেহ ত্রিতল হর্ম্মোপরি দ্বিরদ-রদ-কারুকার্য্য-খচিত-মেহাগনি-দারুনির্ম্মিত-পর্য্যঙ্ক-বিস্তৃত-বিনিন্দিত-দুগ্ধ-ফেণ শয্যায় শয়ন করিয়া রুদ্ধ বাতায়ন পথে প্রবেশপ্রার্থী বায়ুর বিনয়মধুর বেণু বিগঞ্জিত স্বরে অনুযোগ শ্রবণ করেন; কখন বা ঝটিকাতাড়িত নীরশীকর সমূহকে নিজ কক্ষ্যায় সাধ করিয়া আশ্রয় দেন। কেহ বা কুটীরের ভিতরে থাকিয়া বৃষ্টির জলে প্লাবিত হইতে থাকে, এবং ঝড়ের সঙ্গে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়। কেহবা গাছ চাপা পড়িয়া মরে, কেহ বা চাল চাপা পড়িয়া। কেহ দিন বুঝিয়া বিবিধ বিধানে আহারের ফর্মাশ করেন; যে ব্যক্তি "দিন আনে, দিন খায়" সে বিনা আয়োজনে উপবাস করিয়া ঝড় বৃষ্টি অতিবাহিত করে। আবার যদি রাত্রিতে এরূপ হয়, তবে কত নাগর নাগরী বিদ্যুৎ-ঝলালোকিত পথে বারিসিক্ত হইয়া বিরহ যন্ত্রণা অথবা প্রণয়-সুখের বিশেষ স্বাদ গ্রহণ করে। কখন বা কোন গ্রন্থকার ঝড় বাদলে আপন পুঁথি বোঝাই করিয়া লন। যাহার যে ইষ্টানিষ্ট হউক, বক্ষ্যমাণ ঝড়ে আমাদের কোন উপকার দর্শিল না; বরং কত মাঠের কত নিরাশ্রয় পথিকের মত, আমাদের প্রিয় গবেশ এবং প্রিয়তম মধুসূদন মুদীর দোকান হইতে দূরীকৃত হইয়া কতক দূর যাইতে না যাইতে ভিজিয়া ঢ্যাপ্‌ঢেপে হইয়া গেলেন। আহা! বর্ষার কাকের ন্যায় তাঁহাদের দুই জনকে সে সময়ে

দেখিলে কাহার না সমবেদনা উপস্থিত হইত, কাহার চক্ষের জলে বক্ষ না ভাসিয়া যাইত ?

মধুসূদন ও গবেশচন্দ্রকে নরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া, পিসী তাবৎকালের জন্য ভাবনাকে বিরাম দিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু তাঁহার কান্নাও স্থগিত ছিল। কিন্তু পিসীর এই একটী রোগ ছিল, যে তিনি না কাঁদিয়া অধিক দিন থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং এবার কিছু অধিক কাল ব্যাপিয়া কাঁদিবার অবকাশ না পাওয়াতে পিসীমা কিছু স্ফীত হইয়াছিলেন। যখন মধুসূদনের মুখে নরেন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা পাইলেন, তখন পিসীমা ছয় মাসের কান্না এক দিনে কাঁদিলেন; শরীরের অনেকটা দূষিত জল বাহির হইয়া গেল, কিন্তু পিসীর শরীর তাহাতে টুটিল না। লোণা জল পিসীর বুকে বসিয়াছিল; সে জন্য পিসী সর্ব্বদা কাশিতে আরম্ভ করিলেন। পিসীর এক অঙ্গ ছাড়িয়া এক অঙ্গ ফুলিতে লাগিল, পিসী তাহাতে কাতর হইলেন। গ্রামবাসী নফর কবিরাজের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ হইল। নফর মলা তুলিয়া যে সকল বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল, তাহাতে পিসীর তাদৃশ উপকার দর্শিল না। কাশের এবং স্ফীতির উন্নতিই হইতে লাগিল।

কবিরাজ কিছু বিব্রত হইল; মধুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল যে লক্ষণ ভাল নহে, সুতরাং মধুর মত হইলে

চূড়ান্ত ঔষধি প্রয়োগ করা যায়। মধুসূদন দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইল। রাত্রিতে মহৌষধি দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঔষধির গুণ ধরিল। পিসীর শরীরের সমস্ত জল, এবং কাশাদি ঔষধিতে শুষিতে লাগিল। পিসীর জল টান ধরিল। শেষে জলে কুলায় না। সমস্ত রাত্রি জলদান করিয়া প্রভাতে জল বন্ধ করা হইল। সে দিন একাদশী।

যে পিসী জলভাণ্ডার হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ঔষধের মহিমায় দাবানল জ্বলিতে লাগিল। বিকালে পিসীমার প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; সুতরাং প্রাণ-হীনা পিসী সংসারে থাকিবেন কেন, তৎক্ষণাৎ কাশী গমন করিলেন। গঙ্গাতীরে কেহ তাঁহার দেহ লইয়া গেল না, বাটীর প্রাঙ্গণেই "শ্রীশ্রী৺ তীরে ৺ স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার ৺ প্রাপ্তি" হইল। অগ্নি দ্বারা সৎকার হইল, কিন্তু একাদশীর দিনে কেহ তাঁহার চিতা ধৌত করিল না।

নরেন্দ্রনাথ! তুমি কোথায় রহিলে?

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

## বড় গোপনীয় কথা।

রাত্রি প্রভাত হইল। সংসারের চোখ ফুটিল। কতকগুলা কাক কা কা স্বরে পরামর্শ করিয়া সরল এবং নির্ব্বোধ বালক বালিকার উদ্দেশে একটা গাছ হইতে উড়িয়া গেল; ইহারা বিলক্ষণ রূপে জানে, যে সকালেই ছেলের পাল ইহাদের জন্য উপঢৌকন সামগ্রী লইয়া বাড়ীর উঠানে এবং পথে পথে নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়। কাকের দল উড়িয়া গেল দেখিয়া আনন্দে একটা কোকিল কোন অদৃশ্য স্থান হইতে কুহু কুহু করিয়া উঠিল; বুঝি সে কাকের বাসা কখন খালি হইবে, সমস্ত রাত্রি তাহাই ভাবিতেছিল। আর কতকগুলা পাখী কোকিলের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ক্যাঁচ্ ম্যাচ্ করিয়া এক মহা কলরব তুলিল; ইহারা হয় বড় ধার্ম্মিক; নয়, নিতান্ত দ্বেষপরবশ;—সংসারে ইহাদের মত লোক অনেক। একটী স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীর তীরে, এই ব্যাপার হইতেছিল। সেই পুকুরের জলে নক্ষত্রকুল সমস্ত রাত্রি নিজ নিজ মুখ দেখিতেছিল। পক্ষীদের কলরবে একটা বড় মাছের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মাছটা অমনি জল হইতে শূন্যে লাফাইয়া উঠিল; কি দেখিল, কি বুঝিল,

বলা যায় না, কিন্তু তখনই আবার জলের ভিতর ডুব দিল, আর তখন উঠিল না। একটা মাছ লাফাইল, কিন্তু সমস্ত পুকুরের জল তোল্‌পাড়্‌ করিতে লাগিল, এক জন মাত্র ইংরাজের মুখের কথায় সমুদায় বঙ্গদেশ টলিয়া উঠে;—এসব পরাক্রমের কাজ। জল চঞ্চল হইল, আর মুখ ভাল দেখা যায় না, এজন্য নক্ষত্রগণ কোথায় সরিয়া পড়িল।

এই পুষ্করিণীর ধারে, যে গাছে কাক ছিল, সেই গাছের তলায়, এই সময়ে দুটী লোক বসিয়া; এখনও গ্রামের লোক উঠে নাই, উঠিলেও এই মাঝ্‌মাঠে আইসে নাই, গ্রামও এস্থান হইতে আধ ক্রোশের কম নয়। সুতরাং এ দুজন নিশ্চিতই নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের লোক নয়। তবে ইহারা কে? আমরা বলিতে পারি।

ঐ যে গর্ণেটের চায়নাকোট গায়—বোধ হয় আর বলিতে হইবে না—উনি নরেন্দ্রনাথ। চাদরখানি পাগড়ী করিয়া মাথায় বাঁধা, নরেন্দ্র দুই হাতে দুই হাঁটু বেষ্টন করিয়া, দুই পা যোড় করিয়া বসিয়া আছেন। আর, যখন গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে বসিয়াছি, তখন বলিতে ভয় কি,—নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে বাম জঙ্ঘা মাটীতে পাতিয়া, বিমলা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ডানি পায়ের নখ খুঁটিতেছেন; চক্ষু নখের উপর, সুতরাং বিমলা ঘাড় হেট করিয়া আছেন। ইহাঁরা উভয়ে রাতারাতি এতদূর চলিয়া আসিয়াছেন। বিমলার আর চলিবার শক্তি নাই; নরেন্দ্র কিছু ব্যস্ত হই-

লেন। দিন উঠিল, এখন লোকে দেখিতে পাইবে ; পাইলে চিনিতে পারিবে ; তাহা হইলে স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশার এ জন্মে মোচন হইবে না ; নরেন্দ্রের এই ভাবনা। হায়, কি পরিতাপের বিষয়! এই পাপ সংসারে ধর্ম্মের উন্নতি নাই, ধার্ম্মিকের অব্যাহতি নাই।

ভাবনার বিষয় বটে, কিন্তু ভাবিলে কি হইবে? গ্রামেও যাইবার যো নাই ; মাঠে মাঠেই বা দুই জনে কত ঘুরিয়া বেড়াইবেন? আবার মাঠেও এখনি লোক যাতায়াত আরম্ভ হইবে। যাইবেন বা কোথায়? রাত্রিকালে কোন্ পথে কত দূর আসিয়াছেন, ইঁহারা তাহারি কিছুই জানেন না। বিমলাও আর চলিতে পারে না ; এখন উপায়? বসিয়া থাকাও অবিবেচনার কাজ, এই বলিয়া দুই জনে সেখান হইতে উঠিলেন। সম্মুখে কতক দূরে একটা বন দেখা গেল ; দুই জনে সেই বনের দিকে চলিলেন। বাসনা, দিনমান বনের মধ্যে থাকিয়া, রাত্রিতে যাহা হয় এক প্রকার করা যাইবে। নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস এই যে মনুষ্য অপেক্ষা হিংস্র জন্তুগণ ধর্ম্মভয়ে অধিকতর ভীত। আমাদেরও সময়ে সময়ে এ কথায় বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

যখন নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলা বনের নিকটে গেলেন, তখন সেটা যে সিংহ ব্যাঘ্রের আবাস নয়, এ কথা নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অগোচর রহিল না। বনের মধ্যে প্রবেশ করিবার একটী অপ্রশস্ত কিন্তু সুপরিষ্কৃত পথ দেখিতে

পাইয়া, ইহাঁরা দুই জনে সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। বনের সর্ব্বত্রই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাল, তেঁতুল, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, প্রভৃতি ফলের গাছ; লতা গুল্মাদি খুব অল্প। বনের মধ্যে একটী পুষ্করিণী; তাহার জল নির্ম্মল। ঘাট একটীও নাই; কিন্তু যে দিকেই নামো, পুকুরের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত কোথায়ও পায়ে এক বিন্দু কাদা লাগিবে না, জলের ভিতর সমস্তই কঙ্করময়। পুকুরের এক পাড়ে কতকগুলি গরু চরিতেছিল; এখন তাহাদের প্রথম গ্রাস, সুতরাং কেহ কাহারও দিকে ঘাড় তুলিয়া চাহিয়া ছিল না। ইহারা সময়ের মূল্য বুঝে। একটী রাখাল বালক মানুষের লজ্জাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য কটির নিম্ন হইতে জঙ্ঘার উপর পর্য্যন্ত সুমলিন একটু খানি কাপড়ে আবৃত করিয়া, পাঁচনির উপর ঠেশ্ দিয়া (ত্রিভঙ্গ না হউক) ভঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া, গান করিতেছিল, এবং সেই স্থানকে গোকুলত্ব প্রদান করিতেছিল। বনের ঠিক মধ্যস্থলটী অতিশয় মনোহর; তিনখানি ছোট ছোট মেটে ঘর; তার মেজে অবধি উঠান পর্য্যন্ত সমস্তই তক্ তক্ করিতেছে; যেন মুখ দেখা যায়, যেন সিন্দূর পড়িলে, তুলিয়া লওয়া যায়। আবার এমন স্থান পাছে সূর্য্যের খর দৃষ্টিতে পড়ে, এই জন্য একটা প্রাচীন বটগাছ, ঘরের চালের উপর দিয়া ডাল পালা বাড়াইয়া ইহাকে উত্তম রূপে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সেই আশ্রয়ে নানা রকমের কতকগুলি ফুলগাছ প্রতিপালিত হইতেছিল, এবং

কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য সর্ব্বদা পুষ্পোপঢৌকন লইয়া প্রস্তুত থাকিত।

যখন নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে সঙ্গে করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল, একটু ভয়েরও সঞ্চয় হইল; কিন্তু পরক্ষণেই সম্মুখে একটী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার এ ভাব দূরে গেল, ভাবনা করিবার অবকাশ রহিল না। শ্রীরূপ দাস বাবাজী নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইবা মাত্র অবিচলিত ভাবে বসিয়াই রহিলেন; যখন বিমলাকে দেখিলেন, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দুই জনকে বসিতে বলিলেন।

বাবাজী দিব্য হৃষ্ট পুষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। মস্তকের লম্বা লম্বা চুল গুলি মধ্যস্থলে সংযমিত; বাবাজীর নাকে মাটী চাপান, এজন্য নাসার গঠন ঠিক বুঝা অসাধ্য; ছোট ছোট দুটী চক্ষু যেন কোন অভাগা কপোতের কাছে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ঠোঁট, গোঁফ দাড়ীর মধ্যে লুকান, যেন অশোক বনে সীতা। গলার কিছুই ঠিকানা হইবার যো নাই, মালায় আচ্ছন্ন, তাহার উপর দাড়ী; দেখিলে এই মাত্র অনুমান হয় যে একটা কাঠের পালার উপর যেন একখানা কম্বল কেহ পাতিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পরিধানে বহির্বাস। বাবাজী তিনটী তিন প্রকারের সেবাদাসীকে আশ্রয় দিয়াছেন; প্রথমটী, দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, মস্তকে খুব খাট চুল, গোঁফ দাড়ী

থাকিলেই, পুরুষ বলিয়া এক প্রকার চালান যাইতে পারে; ইনি দুকুড়ি শীতের খবর দিতে পারেন। মধ্যম, খুব বেঁটে, খুব কাল, খুব মোটা; ইহার দাঁত পর্য্যন্ত কাল, যেন তুরমুজের বিচি। ইহার বয়স ৩৫। ৩৬। তৃতীয়, পাঁচপাঁচির মধ্যে, আহাও নয়, ছিছিও নয়। দেখিলে বোধ হয়, অল্প দিন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে, এখনও শিকলি কাটা রকমটা যায় নাই।

নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলা ভূতলে আসন গ্রহণ করিলে, সেবাদাসীরা তাঁহাদের নিকটে আসিয়া যুটিল, এবং ইহাঁদের দুই জনকে বেষ্ঠন করিয়া বসিল। বহুতর আলাপ হইতে লাগিল, এবং কথা বার্ত্তার আদান প্রদানে নরেন্দ্রনাথ জানিতে পারিলেন, যে এই বনের নাম "আখড়া গোপালপুর"। গ্রাম গোপালপুর এখান হইতে অতি নিকট, আধ ক্রোশের মধ্যে। নরেন্দ্র আরও জানিলেন, বাবাজী সংসার ত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে বনের পাখীর সঙ্গী হইয়া "প্রেমভক্তি" বিলাইয়া থাকেন; এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সেবাদাসী গ্রামে গ্রামে যাহা কিছু ভিক্ষা করিয়া আনে, তাহাতেই বাবাজীর জীবন ধারণ হয়। কখন কখন কনিষ্ঠ সেবাদাসীকে সঙ্গে লইয়া বাবাজী স্বয়ং ভিক্ষায় যাইতেন, এবং হরিগুণ ও কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য গান করিয়া সাধ্যানুসারে সকলকে, বিশেষতঃ অবলা জাতিকে ভক্তির পথ শিক্ষা দিতেন। এই সকল শুনিয়া নরেন্দ্রের মন

গলিয়া গেল; জলে জল মিশিয়া গেল, সংসারের মধ্যে "তিনি এবং বাবাজী" দুই জনেরই এক প্রকার উদ্দেশ্য ইহা বুঝিতে পারিয়া, তিনি বাবাজীর সহিত প্রণয় বন্ধনের চেষ্টা করিলেন। শুদ্ধাত্মা রূপদাস বাবাজীও নরেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব শুনিবা মাত্র, নরেন্দ্রের সহচরীর প্রতি বারেক দৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহাঁদের দুই জনকে সেই খানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন "আমি আর তুমি; বরং আমার চেয়েও তুমি। আহা!— সত্যমেব জয়তে; ওঁ তৎসৎ" এই টুকু মনে মনে বলিলেম।

দিনমান, নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলা সেই আখড়ায় থাকিলেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরূপদাসের সহিত বহুবিধ সাধুপ্রসঙ্গে দিন কাটাইতে লাগিলেন; প্রেমের জন্য প্রকৃতির সৃষ্টি, শ্রীরাসলীলামৃত হইতে অনেক উদাহরণ দেখাইয়া, বাবাজী এই কথা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন; এবং অবলাগণের উদ্ধারের জন্য পুরুষের সৃষ্টি, নরেন্দ্রনাথ বেদের মন্ত্রাদি নিজের "আর্ষ" মতে আবৃত্তি করিয়া, সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুজনেরই পরস্পরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ প্রভৃতি জন্মিতে লাগিল। এদিকে বিমলার যাহা কিছু পেটের খবর, প্রধান বৈষ্ণবী তাহা ছলে, কৌশলে (বলে নয়) টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। সংসারের যাবদীয় বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া প্রধান বৈষ্ণবী বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং বিমলার পীড়ার কথা

যখন জানিল, তখন বৈষ্ণবী তাহাকে সকল চিন্তা দূর করিতে বলিল, এবং কহিল "তুমি যদি কিছু দিন এখানে থাকিতে পার, তাহা হইলে, আমিই তোমার ভাল ক'রে দিই; আমি এক ওষুধ জানি, এক দিন খেতে হয়, কিন্তু পনর কুড়ি দিন একটু নিয়মে থাকিতে হয়।" বিমলা এক প্রকার সম্মত হইল; কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছার উপর সেই মীমাংসার নির্ভর, জানিয়া নরেন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে জানাইল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া নরেন্দ্র কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; বলিলেন "আচ্ছা দেখা যাবে"। বাবাজীর প্রতি নরেন্দ্রনাথের অচলা ভক্তি জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি উপস্থিত বিষয়ে তিনি সহজে মনের কাঁটা খোঁচা সরাইতে পারিতেছিলেন না; অথচ বিমলার পীড়া, বিমলার ইচ্ছা প্রভৃতি মনে করিয়া, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট অসম্মতি ব্যক্ত করিতেও তাঁহার সাহস হইল না; অগত্যা কিছু কালের জন্য নরেন্দ্রনাথ ত্রিশঙ্কুর শিবের ন্যায় শূন্যেই রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আখ্ড়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দুটী একটী করিয়া অনেকগুলি স্ত্রীলোক সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল; ইহাদের বয়স গড়ে ২৬। ২৭ বৎসর, সর্ব্ব কনিষ্ঠার, ১৮। ১৯, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠার ৩৫। ৩৬ বৎসর। আসিয়া সকলেই একে একে বাবাজীর চরণ-স্পর্শ করিয়া স্ব স্ব মস্তকে হাত বুলাইল, কেহ বা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নিজের জিহ্বাস্পর্শ করিল। এই অনুষ্ঠান সমা-

পন করিয়া সকলে বাবাজীর সম্মুখে কাতার দিয়া বসিল। বাবাজী শ্রীরাসলীলামৃত হইতে তত্ত্ব কথা সকল উদ্ধৃত করিয়া ইহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ সাঙ্গ হইলে প্রদীপ নির্ব্বাণ করা হইল, এবং কৃষ্ণভক্তিময় গীতের তরঙ্গ উঠিল। গীত সমাপ্ত হইলে, আখ্ড়ার প্রধান বৈষ্ণবী ইহাদিগকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিল; পরে ইহারা বাবাজীকে পুনর্ব্বার প্রণিপাত করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলেন, শ্রীরূপ-দাস একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, বৈরাগ্য ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রশস্ত ধর্ম্ম আর নাই, সুতরাং তৎকালের জন্য তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। বাবাজীর বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিত করিলেন, এ ধর্ম্ম-ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে বিমলাকে ছাড়াইয়া লইয়া যাওয়া ধর্ম্মতঃ অসাধ্য; বিশেষতঃ তিনি অসহায়, এখন আপনি কোথায় যাইবেন, কোথায় থাকিবেন, তাহারই স্থিরতা নাই; বিমলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি কি করিবেন?

যখন এই পরামর্শ স্থির হইল, তখন নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি এক্ষণ পীড়িত, এবং এখানে পীড়া নিবারণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অতএব তোমার ইচ্ছায় আমি সম্মত হইলাম; তুমি এখানে কিছু দিন থাক; এই সময়ের মধ্যে আমি একবার কলিকাতা হইতে ঘুরিয়া

আসি, এবং সেখানে এক রকম থাকিবার আয়োজন করিয়া, প'রে আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।" বিমলা এ কথায় দ্বিরুক্তি করিল না।

বাবাজীর নিকট এ কথার প্রস্তাব করা হইল; প্রধান বৈষ্ণবী প্রস্তাবের পোষকতা করিল; বাবাজী প্রসন্নচিত্তে বিমলাকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। সকল পক্ষের সন্তোষ জন্মিল। নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, রাজহাটের কেহ এ কথার সূচ্যগ্র সন্ধান পাইবে না, তিনি স্বয়ং বিষয়-চেষ্টার অবকাশ পাইলেন, অথচ যখন আসিবেন তখনই বিমলাকে পূর্ণালোকে লইয়া যাইতে পারিবেন। নরেন্দ্রনাথ বাবাজীর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, দশ হাজার সাধুবাদ দিলেন, বাবাজী কেবল বলিলেন "প্রভুর ইচ্ছা।" হে বাবা-জিন্! তোমারই ত্যাগ স্বীকার ধন্য! তোমারই বৈরাগ্য সার্থক!

রাজহাট হইতে আখড়া গোপালপুর প্রায় ৪। ৫ ক্রোশ পশ্চিম দক্ষিণ। রেলওয়ে এখান হইতে অতি নিকট, এমন কি দেড় ক্রোশের ঊর্দ্ধ হইবে না। নরেন্দ্রনাথ পর দিন বাবাজীর হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া স্বয়ং কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

পাঠক বর্গ, ক্ষমা করিবেন। আমরা দায়ে পড়িয়া গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলাম।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

## সম্বন্ধ-বন্ধন।

৺শঙ্করী ঠাকুরাণী ওরফে পিসীমার পরলোক গমনে মধুসূদন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। গৃহকার্য্য কে করিবে, রন্ধনাদি কে করিয়া দিবে, এ দিকে দোকানই বা কি রূপে চলিবে, মধুসূদন এই সকল ভাবনায়, স্রোতে পতিত তৃণের ন্যায় হইলেন। যদি এই বিপদ্‌কালে গবেশ রায় না থাকিত, তাহা হইলে মধুসূদনের দশায় কি হইত, বলা যায় না। পিসীর মৃত্যুর পরক্ষণ হইতে গবেশ রায় সান্ত্বনা-বাত্যা প্রবাহিত করিয়া মধুসূদনের চিন্তা সাগরকে তোলপাড় করিতেছিল। গবেশ যথার্থ সময়ের বন্ধু; সেই বিষম দিন হইতে, এক বেলার জন্য মধুসূদনকে ছাড়িয়া যায় নাই। এমন কি, গবেশের গাঢ় আসক্তিতে মধু যে মধু, সেও বিব্রত হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রণয়ের অপার মহিমা!—অদ্ভুত শক্তি! জোঁকের তৃপ্তি জন্মিলে জোঁক সেব্য বস্তুকে ছাড়িয়া দেয়; প্রণয়ী গবেশ স্বীয় প্রণয় পাত্র মধুসূদনকে কিছুতেই ছাড়িল না। মধুর বাটীতেই গবেশের আহার, গবেশের শয়ন এবং বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতে লাগিল।

এক দিন গবেশের মাতুল তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, এবং দুই তিন দিন অবধি বাটী না যাওয়াতে কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। গবেশ অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল, "মামার বিবেচনার লেশমাত্র নাই; মধুসূদনের এই বিপদ্ উপস্থিত, ঘরে দ্বিতীয় লোক নাই, এ সময়ে কেমন করিয়া যাইতে পারা যায়? মধুর দুঃখ হইতে কি বাড়ী বড় হইল?" মধু যেমন "পাকশাক" করিতেছিলেন, তাহাই করিতে লাগিলেন, গবেশ যেমন "খাওয়া দাওয়া" করিতেছিল, তাহাই করিতে থাকিল। এইরূপে দিন যায়, এই রূপে রাত্রি যায়; যায় না, কেবল মধুর মন হইতে ভাবনা, এবং মধুর বাড়ী হইতে গবেশ রায়।

পিসীমার ত্রিরাত্র কৃত্য মধুসূদন এক প্রকার সম্পন্ন করিলেন; আয়োজনের সমস্ত কার্য্য করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন; ব্যবস্থা যেরূপ করা আবশ্যক, তাহা গবেশচন্দ্র করিয়া দিল। এই উপলক্ষে একবার মাত্র আমরা গবেশকে দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম। মধুর বাটীতে থাকিয়া বন্দোবস্ত সকল করিবার সময় গবেশ বলিয়াছিল "একলা বসে থেকে থেকে কোমর ধরে গেল, ভ্যাবা গঙ্গারামটা বাড়ী এলে যে বাঁচি। কাজ ভারি, তার বাজার করাই কুলোয় না।"

এই রূপে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল; ইহার মধ্যে গবেশ দুই বার মাত্র তাহার মাতুলের বাটীতে গিয়াছিল।